ইসলাম

আধুনিক যুগের রূপকার

মওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খান

ইসলামঃ আধুনিক যুগের রূপকার

মওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খান

বাংলা অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ তায়েফ হাসান খান

সম্পাদকমণ্ডলী:

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ
মুস্তাফা কামাল হায়দার
সুবেদার মেজর মহিউদ্দিন মণ্ডল

Urdu Version: Islam Daur e Jadid Ka Khalique
English Version: Islam Creator of the Modern Age
Bengali Version: ইসলামঃ আধুনিক যুগের রূপকার
First published 2023

Goodword Books
A-21, Sector 4, NOIDA-201301
Delhi NCR, India
Tel. +9111-41827083, Mob: +91-8588822678
email: info@goodwordbooks.com
www.goodwordbooks.com

Center for Peace and Spirituality
1, Nizamuddin West Market, New Delhi-110 013
Mob. +91-9999944119
email: info@cpsglobal.org
www.cpsglobal.org

Peace and Spirituality Forum
(Bengal Chapter of CPS International)
mwkbangla@gmail.com

Printed in India

সূচিপত্র

লেখকের প্রাককথা.. ৫

১.০ প্রথম অধ্যায়
১.১ ইসলামঃ আধুনিক যুগের রূপকার ১১
১.২ অন্ধকার থেকে আলোর পথে.................................. ১২
১.৩ বহুশ্বরবাদের (শিরক) নেতিবাচক প্রভাব...................১৬
১.৪ ইসলামের ধারণা.. ২১
১.৫ সমগ্র অনিষ্টের মূল উৎস......................................২২
১.৬ অনুসন্ধানের স্বাধীনতা..২৫
১.৭ আরবীয় প্রভাব.. ২৯
১.৮ আধুনিকতার দিকে চারটি পদক্ষেপ.......................... ৩১
১.৯ আধুনিক মানব..৩২
১.১০ অগ্রগতির দিকে যাত্রা..৩৪
১.১১ শিক্ষা অর্জন এবং ইসলাম.................................... ৩৯
১.১২ ইসলাম হৃদয়ের মুক্তিদাতা.................................. ৪৭
১.১৩ প্রাচীন গ্রিস.. ৪৮
১.১৪ রোমান সভ্যতা.. ৪৯
১.১৫ বিজ্ঞানের ঊষা.. ৫০
১.১৬ অগ্রগতির দিকে যাত্রা..৫১

২.০ দ্বিতীয় অধ্যায়
২.১ অনৈশ্বরিক বস্তুকে ঐশ্বরিক জ্ঞান করা.......................৫৪
২.২ একটি উপমা.. ৫৯
২.৩ বিজ্ঞানের সূত্রপাত..৬২
২.৪ কিছু উপমা..৬৩

২.৫ পৃথিবীর বয়স..৬৫
২.৬ গ্রিক বিজ্ঞান.. ৬৬
২.৭ প্রকৃতি বিজ্ঞান.. ৬৯
২.৮ বিশ্ব মানবতাকে ইসলামের উপহার........................... ৭২

৩.০ তৃতীয় অধ্যায়
৩.১ জ্ঞান বিজ্ঞানে মুসলিমদের অবদান............................ ৭৪
৩.২ সৌরজগত.. ৭৫
৩.৩ চিকিৎসা বিজ্ঞান.. ৭৮
৩.৪ একটি উপমা.. ৮০
৩.৫ ভাষা বিজ্ঞান.. ৮৩
৩.৬ সংখ্যা বিদ্যা ৮৬
৩.৭ একটি উপমা.. ৮৯
৩.৮ কৃষি ও সেচ সম্প্রসারণ... ৯২
৩.৯ ইতিহাস বিজ্ঞান.. ৯৫

৪.০ চতুর্থ অধ্যায়
৪.১ স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব ১০৬
৪.২ একটি ঘটনা.. ১০৮
৪.৩ নব সভ্যতার সৃষ্টি... ১১১
৪.৪ চিন্তার স্বাধীনতা.. ১১২
৪.৫ মানব বৈষম্য.. ১১৪
৪.৬ মত প্রকাশের স্বাধীনতা... ১১৫
৪.৭ ধর্মীয় সহনশীলতার কিছু উপমা.............................. ১১৭
৪.৮ ধর্মীয় স্বাধীনতা.. ১১৯
৪.৯ আধুনিক যুগ এবং ইসলাম.. ১২০
৪.১০ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা.............................. ১২১

তথ্যসূত্র ১২৩

প্রাককথন

আমেরিকান নভোচারী নীল আর্মস্ট্রং (Neil Armstrong) প্রথম ব্যক্তি যিনি সর্ব প্রথম ২০ শে জুলাই ১৯৬৯ সালে চার দিনের মহাকাশ ভ্রমন সম্পন্ন শেষে চাঁদের বুকে পদার্পণ করেছিলেন। তিনি তার গন্তব্যে পৌঁছে ঐতিহাসিক একটি উক্তি করেছিলেন। 'That's one small step for man, one giant leap for mankind.' অর্থাৎ "একজন মানুষের জন্য এটি একটি ছোট পদক্ষেপ কিন্তু সমগ্র মানব জাতির জন্য এ এক মহা উল্লম্ফন।

আর্মস্ট্রং তার সহকর্মী অ্যাডউইন অ্যালড্রিন (Edwin Aldrin) এবং মাইকেল কলিন্স (Michacl Collins) সহ অ্যাপলো-১১ (Apoollo-11) নামে একটি বিশেষ রকেটের সহায়তায় এই বিশেষ সফরটি সম্পন্ন করেন এবং চাঁদের পৃষ্ঠতলে অবতরণ করার জন্য সর্বশেষ পর্যায়ে তাঁরা (Eagle) ঈগল নামে একটি চন্দ্রযান ব্যবহার করেছিলেন (যা অনেকটা গাড়ীর মত)।

এই অ্যাপলো-১১ এবং ঈগল নামক চন্দ্রযানগুলি কল্পিত বা শ্রুত কাল্পনিক যাদুর তৈরি উড়ন্ত রথের মত ছিল না; বরং তা দৃঢ় অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক (Mashing) যন্ত্র ছিল। তাঁরা প্রাকৃতিক রীতি বা আইন গুলিকে ব্যবহারের দ্বারাই এই মহাকাশ সফরের পথ তৈরী করেছিলেন।

যে সকল সূত্র প্রয়োগের ফলে মানুষ চাঁদে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিল,তা অনাদিকাল হতেই সমগ্র বিশ্বজুড়ে বিদ্যমান ছিল। তবুও সেগুলি আবিষ্কার করতে মানুষের বহু শতাব্দীর প্রয়োজন হয়েছে। (চন্দ্রে অবতরণের পূর্বে) এ সম্পর্কে কল্পনাও করা হয় নি যে, এসকল প্রাকৃতিক আইনগুলির সম্পর্কে গবেষণা করা যায় এবং এর দ্বারা অর্জিত জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করে চাঁদে পৌঁছানো যায়। (চিরস্থায়ী এই) প্রাকৃতিক সম্ভাবনাগুলি পূর্ব থেকে বিদ্যমান থাকার পরও কেন মহাকাশ যাত্রার প্রস্তুতি এত হাজার বছর বিলম্বিত হল?

এর একমাত্র কারণ হলো,বহুশ্বরবাদের (শিরকের) প্রাদূর্ভাব বা কোন সৃষ্ট বস্তুকে (মাবুদ) ঈশ্বর জ্ঞান করে তার উপাসনা করা। প্রাচীণ যুগে, সমগ্র বিশ্বব্যাপী বহুশ্বরবাদের বিশ্বাস বিস্তৃত ছিল। অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় চন্দ্রকে দেখে মনুষ্যবোধে চন্দ্রকে জয় করার চেতনা জাগ্রত হয়নি বরং তার সম্মুখে নতজানু হওয়ার চেতনা জাগ্রত হয়েছিল। চন্দ্রকে পবিত্রতার ধারক বা ঐশ্বরিক জ্ঞান করাই চন্দ্র জয়ের জন্য মূল বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মানুষ যে চন্দ্রকে জয় করেবে তা নিয়ে গবেষণা -পর্যালোচনা (তৎকালীন সময়ে) কল্পনাও করা যেত না।

খ্রিস্টাব্দ সপ্তম শতাব্দীতে সর্বপ্রথম এমনতর হলো যে,ইসলামের দ্বারা এক মহা গণবিপ্লবের সূচনা হলো যার দ্বারা বহুশ্বরবাদকে নিশ্চিহ্ন করে গৌরবময় একেশ্বরবাদের বিজয় ঘটে। এই বিপ্লব সর্বপ্রথম আরব ভূমিতে শুরু হয়, অতঃপর তা এশিয়া ও আফ্রিকা হয়ে ইউরোপ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তৎপরবর্তীতে এই বিপ্লব অ্যাটলান্টিক সমুদ্র অতিক্রম করে আমেরিকাতেও প্রবেশ করে।

বিশ্ব জগতে মুসলিমদের আগমন, এই ধর্মীয় বিপ্লবের সাথেই ঘটে। অন্যদিকে পাশ্চাত্যজগৎ তাদের নিজস্ব পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে এই বিপ্লব সম্প্রসারিত করে। তারা ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞানকে ধর্ম থেকে পৃথক করে, ধীরে ধীরে র্তমান চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে আসে। চন্দ্র অভিযান তারই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ন্যাশনালাইজেশন বা জাতীয়করন যেরূপ মার্ক্সের দ্বারা বিবর্তিত দার্শনিক ব্যবস্থার একটি অর্থনৈতিক অঙ্গ তেমনই আধুনিক বিজ্ঞান ইসলামী বিপ্লবের একটি অঙ্গ, যাকে তার উৎসমূল থেকে পৃথক করা হয়েছে।

সকল প্রকার বিজ্ঞান, বর্তমানে যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Natural Science) বলা হয়, তার ক্ষেত্রে এই কথাটি সমভাবে প্রযোজ্য। বহুশ্বরবাদের দৃষ্টিকোন থেকে যেহেতু প্রত্যেক প্রাকৃতিক বস্তুকে দৈব জ্ঞান করা হতো, সেইহেতু বিজ্ঞানের এই ক্ষেত্রগুলি তখন নিষিদ্ধ ছিল। একত্ববাদ (তাওহীদ) এর বিপ্লবের ফলে, প্রাকৃতিক বস্তুকে পবিত্রতার (ঐশ্বরিকতার) স্থান থেকে সরিয়ে তাকে নিয়ে গবেষণা ও নিরীক্ষনের দ্বার উন্মুক্ত হয়।

ফলে মানব ইতিহাসে, প্রাকৃতিক সকল সৃষ্ট বস্তুকে নিয়ে গবেষণা ও পর্যালোচনার এক নয়া দিগন্তের সূচনা ঘটে। এই সূচনাময় যুগের হাজার বছরের চলমান প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটার পর, শেষ পর্যায়ে তা আধুনিক বিজ্ঞান এবং আধুনিক টেকনোলজিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। আধুনিক বিজ্ঞান পূর্ণাঙ্গ রূপে ইসলামী বিপ্লবের দান। প্রত্যক্ষভাবে সূচনাপর্বে এবং পরোক্ষভাবে তার উত্তরপর্বে।

এই সত্যকে বিশ্ব কোন না কোন ভাবে স্বীকৃত প্রদান করতে বাধ্য হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে এই বিষয়ে অধিক হারে বই প্রকাশিত হয়েছে, যা এই সকল বাস্তবতার প্রমান বহন করে। যেমন, *The Scientific Achivement of the Arabs*. অথবা *The Muslim Contribution to Civilization*.

বিশেষজ্ঞগণ একমত যে,আধুনিক শিল্পের অগ্রগতি এবং তার অস্তিত্ব আরব মুসলিম প্রভাবের নিকট প্রবলভাবে ঋণী। এ.হাম্বলট (A.Humboldt) লিখেছেন, 'It is the Arabs who should be regarded as the real founders of physics'. অর্থাৎ, আরবদেরকেই পদার্থবিজ্ঞানের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে গণ্য করা উচিত।[১]

ফিলিপ হিট্টি (Philip Hitti) তাঁর লেখা গ্রন্থে History of the Arabs (১৯৭০) লিখেছেন: 'No people in the Middle Ages contributed to human progress so much as did the Arabians and the Arabic-speaking peoples'.

অর্থাৎ, মধ্যযুগে কোন জাতিই মানুষের অগ্রগতিতে এতটা অবদান রাখতে পারেনি,আরবীয়গণ এবং আরবি ভাষাভাষী মানুষগণ যেরূপ অবদান রেখেছেন।[২]

ঐতিহাসিকগণ স্পষ্টই এই বিষয়টির স্বীকৃতি প্রদান করেছেন যে,আরবীয় (মুসলিম) দের মাধ্যমেই জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপে প্রবেশ করেছে এবং তৎপরবর্তীকালে তা থেকেই সর্ব প্রথম রেনেসাঁর সূত্রপাত ঘটে, বিশেষ ভাবে যাকে বলে প্রথম জাগরণ। প্রফেসর হিট্টি (Professor Hitti) লিখেছেন, ৮৩২

খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে বায়তুল হিকমাহ (Bait al-Hikmah) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরবর্তীতে আরবীয়গণ যে সকল বইয়ের অনুবাদ কর্ম সম্পাদন করে এবং যে সকল পুস্তকাদি রচনা করে,পরবর্তীতে তা ল্যাটিন ভাষায় অনুদিত হয়, “This stream was rediverted into Europe by the Arabs in Spain and Sicily whence it helped create the Renaissance of Europe.” অর্থাৎ,"স্পেন এবং সিসিলির পথ ধরে এই ধারা ইউরোপে পৌঁছায়। অতঃপর তার দ্বারাই ইউরোপে বিজ্ঞানের নবজাগরণ বা রেনেসাঁর দ্বার উম্মুক্ত হয়।"[৩]

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসতে পারে, এই আরবীয় (মুসলিম) দের মাঝে এই (বিজ্ঞান মনস্ক) চেতনা জাগরুক হলো কিভাবে? অথচ তারাও প্রাথমিক পর্যায়ে সেই একই পশ্চাদপদতায় ডুবে ছিলো যাতে তৎকালিন সমগ্র জগৎ নিমজ্জিত বা নিমগ্ন ছিল। এই প্রশ্নের একটিই মাত্র উত্তর, আর তা হলো, এক ঈশ্বরের (তাওহীদের) প্রতি বিশ্বাসের দ্বারাই তাদের মানসিকতা ও কর্মের এহেন বিপ্লব ঘটে। অন্যান্য জাতি যখন, বহুশ্বরবাদে (শিরক) নিমজ্জিত ছিলো, ঠিক অন্য দিকে নবী (সঃ) এর আবির্ভাবের পর আরবীয় মুসলিমদের মাঝে একেশ্বরবাদের (তাওহীদের) চেতনা জাগ্রত হয়। দুই জাতির বা সভ্যতার (আরব ও অনারব) মাঝে বিশ্বাসগত এই ব্যবধানের দ্বারা, এই দুই সভ্যতার মাঝে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হল তা একটি সভ্যতা ঘটনার কার্যক্রম দ্বারা রূপ লাভ করেছে, অন্যটি ইতিহাসকে এক নতুন রূপ দান করেছে।

এই গ্রন্থটির উদ্দেশ্য মূলত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোকে তার সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করা এবং আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরব মুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান উপস্থাপন করা। অনেকেই এটাকে মুসলিম জাতির একটি অংশের সাথে সম্পৃক্ত করেছে, আমি তার পরিবর্তে তা ইসলামের সাথেই সম্পৃক্ত করাকে যথাযথ মনে করি। এটি শুধুমাত্র জ্ঞাত ঘটনাবলির বিবরণ মাত্র, মোটেই এখানে অজ্ঞাত কোন বিষয়াবলির বার্তানামা উপস্থাপন করা হয় নি। একটি উপমা উপস্থাপন করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

এটি একটি সর্বজনবিদিত বিষয় যে, ভারত (India) ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। কোন একজন বলতেই পারে যে, এই হিন্দুস্থানকে গান্ধী এবং নেহেরু স্বাধীন করেছেন। তবে খুব গভীরে গিয়ে পর্যবেক্ষন করলে স্পষ্ট বোঝা যাবে, (উক্ত বাক্য প্রয়োগ করার থেকে বরং) এটা বলাই অধিকতর সঠিক হবে যে, আধুনিক জাতীয়তাবাদ (Modern National) এবং গণতান্ত্রিক ধারণা (Democracy Ideas) সমুহই মূলত ভারতকে তার স্বাধীনতা প্রাপ্তির পথে সর্বোচ্চ সহায়ক রূপে কাজ করেছে। তৎকালীন সময়ে গণতান্ত্রিক অধিকার এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তৈরীকৃত মূলনীতির উপর যে গণজাগরণের জন্ম হয়, মূলত সেই জাগরণময় পরিস্থিতিই স্বাধীনতা প্রাপ্তির পথকে সুগম ও ত্বরান্বিত করে, আবার ঐ পরিস্থিতিই কোন এক গান্ধী ও নেহেরুর আবির্ভাবের পথকে সুগম করেছিল, যাদের মাধ্যমে দেশ স্বাধীনতা অর্জনে সফল হয়। যদি এমন চিন্তার বিপ্লব না ঘটাত, তাহলে আমাদের নেতাগণ কতৃক পরিচালিত আন্দোলন সফল হওয়ার সুযোগ কমই থাকত।

আলোচ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে একথা সমভাবে প্রযোজ্য। এতে কোন সন্দেহ নেই যে আরব মুসলিমগণের দ্বারাই জগতে আধুনিক বিজ্ঞান আন্দোলনের সূচনা ঘটে। এই আন্দোলনের প্রাথমিক প্রেরণা এসেছিল পরিবর্তিত চিন্তনরীতির মাধ্যমে যা পুরোপুরি ইসলামের দান। তবে অবশ্যই এই বিজ্ঞানের ইতিহাস শুধুমাত্র একটি জাতির অর্জিত কার্যক্রম হিসেবে প্রশংসিত হতে পারে না। তাই এখন অবশ্যই বিজ্ঞানকে, সত্য আলোকময় ধর্মের (ইসলামের) উপহার হিসেবে দেখতে হবে যা সমগ্র মানবজাতির সকল কাজকে সঠিক ভাবে পরিচালনার জন্য সর্ব শক্তিমান (ঈশ্বর) কতৃক প্রেরিত হয়েছিল।

হেনরি পাইরেননি (Henri Pirenne) এই ঐতিহাসিক বাস্তবতার স্বীকৃতি প্রদান করতে গিয়ে লিখেছেন: “Islam changed the face of the globe. The traditional order of history was overthrown.” অর্থাৎ,"ইসলাম পৃথিবীর রূপ পরিবর্তন করে দেয়। ইতিহাসের চিরাচরিত রেওয়ায়েতের ধারাকে গোড়া থেকে উপড়ে ফেলে দেয়।"[৪]

বইটি ইসলামী বিপ্লবের এই দিকটির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি মাত্র। এই বিষয়ের উপর একটি বিস্তৃত রচনা উপস্থাপন করার উদ্দেশ্য ছিলো। তবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের কাজটি খুবই ধীর গতিতে চলছিলো। অবশেষে আমি অনুভব করলাম যে, আমার শত ব্যস্ততা আমার পরিকল্পিত এই ব্যাপক কাজ করার সুযোগ হয়তো দেবে না। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আর বিলম্ব না করে যতটুকু তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছি তা বই আকারে প্রকাশ করবো। যদি কখনো সময় এবং পরিস্থিতি অনুমতি প্রদান করে তবে আরও গবেষণা চালানো হবে এবং আরও তথ্য যুক্ত করা হবে ইনশাআল্লাহ। তবে যদি সেই পরিকল্পনাটিও সফল না হয়, তবে আমি আশাবাদী যে, ভবিষ্যতে কেউ যদি এই বিষয়ে আরও ব্যাপক গবেষণার লক্ষ্যে অগ্রসর হয় তবে এই প্রতীতিটি তার গবেষণার পাথেও ও সহায়ক সঙ্গী হিসেবে কাজে আসবে।

মওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খান
১৬ এপ্রিল ১৯৯৩

The Islamic Centre
C-29 Nizamuddin West
New Delhi-110 013

প্রথম অধ্যায়

ইসলামঃ আধুনিক যুগের রূপকার

বছরটি ছিল ১৯৬৫ এবং আমি তখন লক্ষ্ণৌ সফরে ছিলাম। সেখানে আমার সাথে এক উচ্চ শিক্ষিত অমুসলিম ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি শুধু ধর্মের বিষয়েই অবিশ্বাসী ছিলেন এমন নয় বরং ধর্ম বিষয়ক আলোচনা ও পর্যালোচনাকেও অর্থহীন বলে মনে করতেন। কথোপকথনের সময় তিনি আমাকে একটি প্রশ্ন করেছিলেন,"যদি ইসলামকে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে দেওয়া হয়, তাহলে ইতিহাসে কি এমন কোন কমতি বা ঘাটতি পরিলক্ষিত হবে?" তার এই প্রশ্ন শুনে আমি জবাব দিয়েছিলাম,"ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে এই পৃথিবীতে যে শূন্যতা ছিলো, সেই একই অভাব ইতিহাসে পরিলক্ষিত হবে।"আমার এই উত্তর শুনে তিনি মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি অনুভব করতে পারলেন যে,সাধারণত অগ্রগতি বা উন্নয়নের শিরোনামে যা কিছু (বা যে বিষয়গুলি) দৃষ্টিগোচর হয় তা প্রাক ইসলামী যুগে বিদ্যমান ছিল না বরং এই সকল কিছুই ইসলামের উত্থানের পরবর্তীতে পৃথিবীতে এসেছে। তখনও তাঁর এই বিষয়ের উপর সন্দেহ ছিলো যে, কিভাবে সমস্ত অগ্রগতি ও উন্নতির ইতিহাসের সাথে, ঐতিহাসিক ভাবে ইসলামের সম্পর্ক রয়েছে, যাকে ইসলামী বিপ্লব বলা হয়ে থাকে?

এই বইটিতে ঐ সকল ঐতিহাসিক প্রশ্নগুলোর উপর পর্যালোচনা করা হয়েছে। এখানে ঐ সকল বিশ্বস্ত প্রতিপাদন নিশ্চয়তার সহিত প্রদান করা হয়েছে যা ইসলামী বিপ্লব এবং আধুনিক উন্নয়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এমন কি, বিষয় বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত ঐ সমস্ত দিকগুলিও আলোচিত হয়েছে, যা মূল বিষয়ের প্রেক্ষিতে পরোক্ষ তাৎপর্য বহন করে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলামই সেই ঐশ্বরিক দিক নির্দেশিকা যা মানুষকে পরকালের শাশ্বত সাফল্যের পথ প্রদর্শন করে। যদিও বিজ্ঞান এবং

শিল্প বিপ্লব ইসলামের মূল উদ্দেশ্য ও ইঙ্গিত মূলক বিষয়ের সাথে সরাসরিভাবে সংযুক্ত নয়। তথাপি এটি একটি অবিসংবাদিত সত্য যে বিজ্ঞান এবং শিল্প উন্নয়ন ইসলামী বিপ্লবেরই ফল। যদি ইসলামের বিপ্লব না ঘটতো তাহলে শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নয়ন পশ্চাৎপদে রয়ে যেত যেরূপ ইসলামের পূর্বে (অন্ধকার যুগে) ছিল।

একটি বৃক্ষের মূল উদ্দেশ্য ফল প্রদান করা; তবে একটি পরিণত বৃক্ষ ছায়াও প্রদান করে থাকে। ঠিক ইসলামের বিষয়টিও এমন। ইসলামের মূল উদ্দেশ্য, সমগ্র মানবজাতির জন্য (প্রভু কতৃক প্রদত্ত) ঐশ্বরিক জ্ঞানের দ্বারা মহা নির্দেশনার দরজা উম্মুক্ত করে দেওয়া। যাতে মানুষ যেন তাদের প্রভুর নিকটবর্তী হতে পারে। আর ইসলাম হল চিরন্তন সত্য। যখন পূর্ণাঙ্গ সত্যের আত্মপ্রকাশ ঘটে তখন তা কেবল সকল কিছুর জন্যই আশীর্বাদের উৎসস্থলে পরিনত হয় তাই নয়, পরোক্ষভাবে তা প্রায়োগিক উপযোগীতামূলক নির্দেশনাও প্রদান করে।

অন্ধকার থেকে আলোর পথে

দয়াময় প্রভু একটি পূর্ণাঙ্গ পৃথিবী সৃজন করেন। অত:পর তিনি সর্ব উৎকৃষ্ট অবয়বে মানুষ সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি মানুষকে পৃথিবীতে বসবাস করতে এবং এখানকার সমস্ত কিছু ব্যবহার করতে নির্দেশ দেন। মানুষকে আরও বলা হয়েছিল যে, 'তোমাদের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা শুধু মাত্র একজনই এবং তাঁকে উপাসনা করতে হবে। ঈশ্বর ছাড়া অন্য কাউকে মানুষ উপাসনা করবে না।'

কিন্তু মানুষ বিপথগামী হল, তারা তাদের দৃশ্যমান বস্তুগুলোকে উপাস্য নির্ধারণ করলো। তারা (মানব জাতি) তাদের সেই অদৃশ্য স্রষ্টার প্রতি মনোযোগের কেন্দ্রস্থলকে দৃঢ় রাখতে ব্যর্থ হলো,ফলে (সেই অদৃশ্য প্রভুর প্রতি) তারা আসক্তি (সম্পূর্ণরূপে) হারিয়ে ফেললো। তখন অধিকতর মন্দরূপে দেখা গেল যে, ক্রমান্বয়ে (তাদের মাঝে প্রকৃত প্রভুর প্রতি যতটা দূরত্ব তৈরি হলো তার চেয়েও অধিকতর) দৃশ্যমান কৃত্রিম দেবতাগুলোর প্রতি চিত্তবৃত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকলো।

ফলে যখনই বা যেখানেই তারা কোন বৃহৎ এবং চিত্তাকর্ষক কোন বস্তু লক্ষ্য করতো, উক্ত বস্তুকে তাদের (অজ্ঞতা ও মূর্খতাবশত) ঈশ্বর বা ঐশ্বরিক ক্ষমতা সম্পন্ন জ্ঞান করতো। এটি একদিকে যেমন ব্যক্তি-দেবত্বের জ্ঞান সৃষ্টি করেছে, ঠিক অন্যদিকে তেমনি প্রকৃতিপূজা (Nature Worship) বা স্বর্বেশ্বরবাদ (Phenomenal Worship) জন্মলাভ করেছে।

ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য বস্তু বা ব্যাক্তি পূজার মধ্য দিয়ে শিরক বা বহুশ্বরবাদের উদ্ভব হয়েছে। এসকল শিরক ক্রমান্বয়ে বিশ্বাস ও অনুশীলনের উপর পূর্ণরূপে আধিপত্য বিস্তার করে এবং প্রতিটি গৃহে ধর্মীয় রীতিনীতির অংশরূপে শুভ-অশুভ লক্ষণের ধারক হিসেবে নিজের অবস্থান গড়ে তোলে। এই সকল শিরক বা বহুশ্বরবাদ আচ্ছন্ন কর্মকান্ড ক্রমান্বয়ে বিশ্বাস ও অনুশীলনের সকল দিকে আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। আবার এই সমস্ত বহুশ্বরবাদী বিশ্বাসের সঙ্গে যখন রাজার দৈব অধিকারের বিশ্বাস যুক্ত হল, তখন তা তাদের রাজনৈতিক কার্যক্রমের অংশে রূপান্তরিত হল।

এটাই ছিলো প্রাচীণ বিশ্বের ধর্ম। প্রাচীণ যুগে পূর্ণাঙ্গ রূপে এই সকল কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসের উপর তারা প্রতিষ্ঠিত ছিল। যাকে ধর্মীয় পরিভাষায় শিরক এবং সাধারণ পরিভাষায় (Superstition) কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধবিশ্বাস বলা হয়।

অতীতে যত নবী ও রাসূলদের আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁদের সকলেই এসকল স্বেচ্ছাচারিতা শোধনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। মানব ইতিহাসের প্রতিটি পর্বেই নবী ও রাসূলগণ (শুধুমাত্র) বহুশ্বরবাদের পরিত্যাগ ও একেশ্বরবাদকে গ্রহন করার আহ্বান জানিয়েছেন। হযরত আদম (আ:) এর সময় হতে ঈসা মাসীহ (Messiah Christ) (আ:) পর্যন্ত এই ধরণীতে এক লক্ষেরও অধিক নবী এবং রাসূলগণের আগমন ঘটেছে। (আল্লাহর নিকট থেকে) তাঁরা যে বার্তা নিয়ে এসেছিলেন, মানবজাতির অধিকাংশই তা স্বতস্ফূর্তভাবে মেনে নেওয়ার বদলে অনাগ্রহ দেখিয়েছে অর্থাৎ অস্বীকার করেছে। ফলে সেই

সকল নবী-রাসুলগণের প্রচারিত বাণী শুধুমাত্র সত্যের ইস্তেহার বা ঘোষণারূপে সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছিল। এই ঐশ্বরিক সত্য বাণীকে তাদের অধিকাংশই (তৎকালীন জাতির গোঁড়ামির জন্য) সমগ্র সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যাপী বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হয়নি।

বহুশ্বরবাদ অথবা কুসংস্কারের মূলোৎপাঠনের বিষয়টি কেবলমাত্র একটি ধর্মীয় অংশে সীমাবদ্ধ ছিল না। এর (বহুশ্বরবাদের) সম্পর্ক মানবজাতির সমগ্র কার্যক্রমের সাথে জড়িত ছিল। এই সর্বাত্মক কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধবিশ্বাসের উত্থান মানব সভ্যতার উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাড়ায়।

তারা প্রকৃতি (Nature) নামক জিনিসকে পবিত্রতার আসনে সমাসীন করার ফলে এসকল বস্তু নিয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণার মানসিকতাকে চূড়ান্ত ভাবে ধ্বংস করে দেয়। অথচ প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা ও বিশ্লেষন ছাড়া বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তারা অস্বীকৃত কিছু ভিত্তিহীন বিষয়ের উপর মানুষের মাঝে উঁচু-নিচু জাতে বিভক্তি, অচ্ছুৎ বা ম্লেচ্ছ হওয়া বিষয়ক বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করেছিল যা মানুষের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠায় অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। বর্তমান অগ্রগতি ও বোধদয়ের ক্ষেত্রে যে সমস্ত নিয়ামকগুলির সংযোজন ঘটেছে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপূর্ণ অনুপুস্থিতির কারণে সে গুলির উদ্ভব দুঃসাধ্য ছিল। আর কুসংস্কারভিত্তিক ধর্ম বিশ্বাসে বিশ্বাসী মানসিকতা, বিজ্ঞান ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি জন্মের পথে কয়েক শতাব্দী ধরে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছিল।

নবী-রাসূলগনের হাজার বছরের সংগ্রাম থেকে এটাই প্রমানিত হয় যে,শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক বা প্রচারধর্মী অভিযানের মাধ্যমে মানবজাতিকে এই ত্রুটিপূর্ণ অবস্থান থেকে বের করে আনার জন্য পর্যাপ্ত নয়। এমনকি তৎকালীন সমগ্র রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তিগুলিও এসকল কুসংস্কারের উপর ভর করে প্রতিষ্ঠিত হতো। এজন্য এসকল কুসংস্কারকে চিরস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখার বিষয়ে শাসকগণ তৎপর থাকতো,যাতে তাদের প্রজাগণ রাজার ঐশ্বরিক উত্তরাধিকারের প্রতি অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা মোহাবিষ্ট হয়ে থাকে (যাতে তারা তাদের সামনে ক্ষমতার

প্রতি কোনরূপ সংশয় প্রকাশ করতে না পারে)। তারা তাদের সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তিকে পূর্ণরূপে ব্যবহার করতো শিরক এবং পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একত্ববাদের পক্ষে জাগ্রত সংগ্রামের পথকে চিরস্থায়ী ভাবে রুদ্ধ করতে।

এমনতর অবস্থার সম্মুখীন যখন গোটা জগৎ, তখন সকলেরই প্রশ্ন ছিল, এর থেকে পরিত্রান কোন পথে? পৃথিবীর এমনতর অবস্থায় ষষ্ঠ শতাব্দীতে (Sixth Century A.D) সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর আবির্ভাব হয়।

সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক আল্লাহর নিজ ফায়সালা ছিল যে, মুহাম্মদ (সাঃ) একজন দ্বীনের প্রচারক হওয়ার পাশাপাশি সংস্কারক হবেন। মহান প্রভু কতৃক তিনি এই মর্মে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন যে, 'তাদের অন্ধবিশ্বাস মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত' কেবলমাত্র এই ঘোষণা করে তিনি ক্ষান্ত হবেন না, বরং এই অন্ধবিশ্বাস উচ্ছেদ করার জন্য প্রয়োজন বোধে তিনি সামরিক তৎপরতা গ্রহণ করবেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবীকে সম্বোধন করে বলেন: "হে মুহাম্মদ! ইহা একটি কিতাব (গ্রন্থ) যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, যার দ্বারা আপনি মানুষদেরকে অন্ধকার থেকে বাহির করে আলোর দিকে নিয়ে আসতে পারেন" (সূরা আল ইবরাহীম, ১৪ ঃ ০১)।

এই একই কার্য পূর্ববর্তী সকল নবী ও রাসূলগণকে অর্পন করা হয়েছিলো, যাতে তাঁরা মানবমন্ডলীকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন। তবে পূর্বতন অন্যান্য পয়গম্বরদের তুলনায় সর্বশেষ নবীর স্বতন্ত্রতা হলো - মহান প্রভু ঘোষণা করেন যে যেহেতু তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না তাই তিনি কেবলমাত্র ঐশ্বরিক বাণী ঘোষণা করে ক্ষান্ত হবেন না, বরং প্রচলিত পরিস্থিতির পরিবর্তনের লক্ষ্যে তিনি বাস্তব সম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

এই কার্যটি কার্যকর করার জন্য যত প্রকার প্রয়োজনীয় উপকরনের দরকার ছিলো, তা সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মদ (সা:) কে গ্রহন করার অনুমতি প্রদান করেন। তথাপি যদি এই কার্যটি সম্পাদনের সময় কোন

ক্রটি বা ঘাটতির সম্মুখীন হতে হয় তবে সে ক্রটি বা ঘাটতি পূর্ণরূপে পুষিয়ে দেওয়ার জন্য ফেরেস্তা (আজ্ঞাবহ) দ্বারা বিশেষ সহায়তা প্রদান করার অঙ্গীকার করেন।

হাদীসে এ বিষয়টি বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিশেষত একটি হাদীসে এই বিষয়টি সরাসরি ব্যক্ত করা হয়েছে - "আমি হলাম নির্মূলকারী, আমার দ্বারা আল্লাহ অবিশ্বাসকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। সুতরাং নবী (সাঃ) শুধু একজন দায়'ই (প্রচারক) নন বরং সেই সাথে একজন সংস্কারক ও নির্মূলকারী ছিলেন। একদিকে তিনি যেমন মানুষকে ধর্মের পথে আহ্বান জানাতেন ঠিক তেমনই ভাবে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে মানুষকে বাধ্যও করতেন। কুরআন স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেছে যে, মানুষের পাশাপাশি আল্লাহর ফেরেস্তাগণও (আজ্ঞাবহগণও) তাঁর উপর প্রদত্ত মিশন সম্পন্ন করার জন্য সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

আর এ সমস্ত ব্যবস্থা এজন্যই করা হয়েছিলো যাতে আল্লাহ তা'আলা যে নব যুগের সূচনা ঘটাবেন সেই সূচনা যেন পূর্ণরূপে ঘটে সেই লক্ষ্যে।

বহুশ্বরবাদের (শিরক) নেতিবাচক প্রভাব

কুরআনের ভাষ্যমতে আদম (আঃ) হলেন প্রথম মানব যাকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়। আল্লাহ তাঁকে বলেছিলেন, "তোমার এবং তোমার পরবর্তী প্রজন্মের ধর্ম হবে একেশ্বরবাদ (তাওহীদ)। শুধু মাত্র ইহাতেই রয়েছে ইহকালীন এবং পরকালীন কল্যাণ"। প্রথমিক পর্যায়ে মানব জাতি সঠিক দ্বীনের (ধর্মের) উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলো। তবে সে সঠিক ধর্মে তারা খুব বেশিদিন প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেনি। যখনই তাদের মাঝে ভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতা দেখা দিলো, তখন থেকে আল্লাহ তা'আলা একের পর এক (নবী ও রাসূল) বার্তাবাহকদেরকে পাঠানো শুরু করলেন (সূরা আল বাকারা, ২ ঃ ২১৩)।

খ্রিস্টের (ঈসা আঃ) প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে নূহ (আঃ) (নোয়াহ) ইরাকে

জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাকে আল্লাহ্ একজন বার্তাবাহক (পয়গম্বর) হিসেবে নির্বাচিত করেছিলেন এবং তার উপর তার জাতির সঠিক পথ প্রদর্শন ও সংস্কারের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। অতঃপর নূহ (আঃ) থেকে মাসীহ (আঃ) পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে বিরতিহীন ভাবে বার্তাবাহকগণের আগমন ঘটে। তারা তাদের (নির্দিষ্ট) সমাজের মানবগোষ্ঠীর সংশোধনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন কিন্তু তাদের জাতির অধিকাংই তাদের আহ্বানে সাড়া দিলো না। পবিত্র কুরআনের ভাষায়:

"অতঃপর আমি একের পর এক পয়গম্বর পাঠিয়েছি। যে জাতির কাছেই পয়গম্বরগণ এসেছেন, তারা তাদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। (সূরা আল মুমিনুন-২৩:৪৪)

তাদের এই (মানসিক) বিকৃতির কারন ছিলো বহিস্থ (জড় জগৎ) ছাড়া অন্য কিছু উপলব্ধি করার অক্ষমতা। অথচ একেশ্বরবাদের মূল ভিত্তিই হলো অদৃশ্য স্রষ্টাকে সম্ভ্রম জ্ঞাপন করা। দূর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, এই অদৃশ্য প্রভুকে তারা তাদের একমাত্র স্রষ্টা হিসাবে গ্রহণ করতে পারলো না। (সেই অদৃশ্য একক সত্ত্বার) পরিবর্তে দৃশ্যমান বিভিন্ন বস্তুকে তাদের দেবতা হিসেবে গ্রহন করলো। পৃথিবীর সূচনালগ্ন একেশ্বরবাদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল,তবে পরবর্তীকালে তা বিকৃত রূপ ধারণ করলো, তার ফলস্বরূপ সমগ্র জগতের ইতিহাস বহুশ্বরবাদের অতল গহ্বরে তলিয়ে গিয়েছিল। একেশ্বরবাদ সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য। মানুষ যখন একজন স্রষ্টায় বিশ্বাস স্থাপন করে তখন তার সকল বিষয়-আশয় সঠিক থাকে। অন্যদিকে যখন তারা এই বিশ্বাস ত্যাগ করে, তখন তাদের সমস্ত বিষয়গুলো রীতি বিরুদ্ধ ও বিকৃত হয়ে যায়। (মূলত) একেশ্বরবাদই সমগ্র মানব জাতির উত্থান ও পতনের মূল চাবিকাঠি।

কুরআন মাজিদ আমাদেরকে বলে: আল্লাহ সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সকল সৃষ্টির রক্ষক। পৃথিবী ও নভোমণ্ডলের সকল ভান্ডারের চাবিসমূহ তাঁরই নিকটে। আর যারা আল্লাহর নিদর্শন সমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছে তারাই মূলত

ক্ষতির শিকার হবে। হে নবী (পয়গম্বর)! এদেরকে বলুন, "হে মূর্খেরা! তাহলে তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো দাসত্ব করতে বলো?" (তোমার উচিত এসকল মূর্খদেরকে স্পষ্ট বলে দেওয়া। কারন তোমার নিকটে এবং ইতিপূর্বের সকল পয়গম্বরদের নিকটে এ মর্মে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করা হয়েছে যে, যদি তুমি বহুশ্বরবাদে লিপ্ত হও তাহলে তোমার সমস্ত কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতএব হে নবী (পয়গম্বর)! তুমি শুধুমাত্র আল্লাহরই উপাসনা করো এবং তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। আল্লাহকে যেরূপ মর্যাদা দেওয়া দরকার এসকল মানুষ তাকে সেরূপ মর্যাদা দেয়নি। মহাপ্রলয়ের দিন গোটা পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে থাকবে আর নভোমণ্ডল তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা থাকবে। যারা তাঁর অংশীদার স্থাপন করছে, তিনি তা থেকে পবিত্র ও অনেক উর্ধে (সূরা আল যুমার, ৩৯ ঃ ৬২-৬৭)।

একেশ্বরবাদ থেকে বিচ্যুতির প্রকৃত ক্ষতির রূপ পরকালীন জীবনে প্রতিভাত হবে। যেহেতু একেশ্বরবাদই এই ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র বাস্তবতা, তাই এই একেশ্বরবাদ থেকে বিচ্যুতির অর্থই বাস্তবতা থেকে বিচ্যুত হওয়া। আর যারা বাস্তবতা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে তাদের পরবর্তী জীবনই শুধু নয় বরং পার্থিব বর্তমান জীবনও চূড়ান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। উপরে উল্লিখিত পংক্তিতে এই বাস্তবতাকেই স্মরণ করানো হয়েছে।

কারণ এর মূল ভিত্তিই হলো এক ঈশ্বরের চেতনা যা মানবপ্রকৃতির অংশ। মানুষ নিজেই নিজের ফিতরাতের (মানবপ্রকৃতির) কারনে বাধ্য যে, সে কোন না কোন ঈশ্বরের আনুগত্য করবে এবং তাঁর সম্মুখে নিজেকে আত্মসমর্পণ করবে। মানুষ এক ঈশ্বরের বিশ্বাসকে অস্বীকার করতে পারে, কিন্তু সে তার নিজের প্রকৃতিকে অস্বীকার করার ক্ষমতা রাখে না। যারা স্রষ্টাকে অস্বীকার করে তাদেরকে তাদের এই (ঘৃণ্য) কর্মের বিনিময় প্রদান করা হয়। আর তা হলো তারা সৃষ্ট বস্তুতে বিশ্বাস স্থাপনে বাধ্য হয়ে পড়ে। তারা অবাস্তব ভাবে সৃষ্ট বস্তুকে সেই মর্যাদা প্রদান করে বসে যা বাস্তবিক ভাবে একমাত্র এক আল্লাহরই প্রাপ্য।

এই মহা বিশ্বের স্রষ্টা ও কর্তা হলেন আল্লাহ। সমস্ত সত্য মহিমা একমাত্র তাঁরই। মানুষ যখন প্রকৃত স্রষ্টাকে তাঁর একমাত্র উপাসনার ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের কেন্দ্রস্থল করে তোলে তখন তারা এমন এক মহা সত্যের মহত্ত্বকে স্বীকৃতি প্রদান করে যিনি মূলত সত্যই এই জাতীয় শ্রদ্ধার এক মাত্র যোগ্য। আল্লাহ মহান, ইহা মান্য করা ও স্বীকৃতি প্রদানের মধ্যে দিয়েই একজন মানুষ প্রকৃত বাস্তবতার সম্মুখে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। এভাবেই তাঁর জীবনটি সত্যকার অর্থে সমস্ত প্রকার দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত স্বাভাবিক জীবনে রূপান্তরিত হয়। সে সকল প্রকার বৈপরীত্য থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তার চিন্তা-চেতনা ও ক্রিয়া উভয়ই সঠিক পথকে গ্রহন করে। তার অস্তিত্ব বাস্তব জ্ঞানের সাথে পূর্ণরূপে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে যায়। তার এবং এই মহাবিশ্বের সত্যর মাঝে তখন আর কোন অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় না।

ঠিক তার বিপরীতে মানুষ যখন এমন করে যে, সে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুকে মহান জ্ঞান করতে থাকে, প্রকৃত স্রষ্টাকে যে মর্যাদা দেওয়া উচিৎ তাই তাকে দিয়ে থাকে, তখন তার দৃষ্টিভঙ্গী অবান্তর হয়ে যায়। ফলে সে বাস্তবচ্যুত ও সম্বন্ধহীন হয়ে যায় যা মহাসত্যর এই বিশ্ব জগৎ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার সমগ্র জীবন বাস্তবতার পথ থেকে বিমুখ হয়ে অনুমান নির্ভর হয়ে পড়ে।

বিষয়টি স্পষ্ট অনুধাবনের জন্য একটি উপমা পেশ করছি, লক্ষ্য করুন: খ্রিষ্টানগণ (Trinity) ত্রিত্ববাদের বিশ্বাসের ভিত্তিতে মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ) কে স্রষ্টার স্থানে বসিয়েছে। কিন্তু বাস্তবিক ভাবে তিনি শুধু একজন মরিয়ম নামক নারীর পুত্র। (অর্থাৎ তিনিও একজন মানুষ ছিলেন, ঈশ্বর নন)। খ্রিষ্টানগণ তার বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করে তাকে স্রষ্টার পুত্রের মর্যাদায় সমাসীন করেছে। তারা তাকে যে মহত্ত্ব ও বড়ত্ত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে, যা একমাত্র স্রষ্টার প্রাপ্য, যিনি ঈসা (আঃ) সহ সকল মানুষের স্রষ্টা। এই বিশ্বাসের ফলস্বরূপ তারা তাদের অবস্থানকে এক মহা বৈপরীত্যের দ্বারা আবদ্ধ করে ফেলে। তাদের বৈপরীত্যগুলোর মাঝে একটি বৈপরীত্য হলো সৌরজগতকে নিয়ে, যার উদ্ভব তাদের এই ধর্মতাত্বিক বিষয়গুলির উপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকার কারনে হয়েছে।

প্রাচীণ জ্যোতির্বিদ টলেমী (Ptolemy) যিনি (৯০-১৬৮) গ্রিসে (প্রাচীণ ইউনান) জন্ম গ্রহন করেছিলেন, তিনি (Alexander The Great) মহান আলেকজান্ডার এর (রাষ্ট্র প্রধান থাকার) সময় একটি গবেষণা চালিয়ে ছিলেন। (সেই গবেষণার বিষয়বস্তু নিয়ে) ল্যাটিন ভাষায় তিনি একটি দীর্ঘ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি এই তথ্য উপস্থাপন করেছিলেন যে,পৃথিবী স্থির রয়েছে এবং চাঁদ, সূর্য সহ সকল গ্রহ নক্ষত্র গুলি পৃথিবীকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করছে। খ্রিষ্টান ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হওয়ার জন্য খ্রিষ্টান ধর্মবেত্তাগণ এই মতকে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকে। যার ফলে মানুষের মন মস্তিষ্কে এ মতবাদটি দীর্ঘদিন যাবৎ একক প্রভাব বিস্তার করে রাখে। শেষ পর্যন্ত ষোড়শ শতাব্দীতে কোপারনিকাস (Copernicus) এর গবেষণার দ্বারা এই মিথ্যা মতবাদটি উৎপাটিত না হওয়া পর্যন্ত মানুষের মস্তিষ্ক ও ক্রিয়ায় ইহা চলমান ছিল।

খ্রিষ্ট মতবাদের মূল ভিত্তিই প্রায়শ্চিত্তের (Atonment) উপর প্রতিষ্ঠিত। (তাদের মতে) ঈশ্বর সমগ্র মানবতার পরিত্রানের মাধ্যম হিসেবে এ পথকেই নির্বাচন করেছেন। প্রায়শ্চিত্তের এই ঘটনাটি এই ধর্মমতের এমন এক অপরিহার্য বিষয় যে তা কেবল মানবজাতির সঙ্গে নয়, বরং সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে সংপৃক্ত। মানব জাতির পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য খ্রিষ্টের এই আত্মত্যাগ সর্বশ্রেষ্ঠ একটি কাজ যা এই পৃথিবীতে সংঘটিত হয়েছে। এই হিসেবে তাদের মত হলো, যীশুর এই কর্মটি যেহেতু সৃষ্টি জগতের সর্ববৃহৎ মর্যাদা সম্পন্ন কাজ, তাই যে স্থানে এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে তা (অর্থাৎ এই পৃথিবী) সমগ্র সৃষ্টি জগতের কেন্দ্রস্থল। সেজন্য সকল খ্রিষ্টসমাজ টলেমীর সেই ভূ-কেন্দ্রিক (Geocentric) তত্ত্বকে সমর্থন করা সহ এই মতকে ধর্মীয় মর্যাদা প্রদান করেছিল।

খ্রিষ্টান পন্ডিতগণ পরবর্তীতে আবিষ্কৃত সূর্য কেন্দ্রিক (Heliocentric) তত্ত্বের সত্যতা প্রমান হওয়া সত্তেও এই মতবাদের বিরোধিতা করেছিল। শেষ পর্যন্ত কোপারনিকাস (Copernicus), গ্যালিলিও (Galileo) এবং কেপলার (Kepler) দ্বারা পরিচালিত গবেষণার ফলে এই তত্ত্বের মিথ্যাচার প্রমানিত হয়।[৫]

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা (Encyclopedia Britannica-১৯৮৪) এর তথ্য অনুসারে, "খ্রিষ্ট ধর্মতত্ত্বের মতে পরিত্রানের (Salvation) ঘটনাটি একটি বৈশ্বিক বা সর্বজনীন ঘটনা। মাসীহ এর এই প্রায়শ্চিত্তের কাজটি বিশ্বজনীন তাৎপর্য বহন করে। এটি সমস্ত মানবকূল সহ সকল প্রানীকূলের সাথেও সম্পর্ক যুক্ত। তবে বর্তমান আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy) অধ্যায়নের থেকে জানা যায় যে, (আমাদের এই) পৃথিবী মহাবিশ্ব নামক বিশাল সমুদ্রের মাঝে ছোট্ট একটি নুড়ি পাথর সাদৃশ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বাস্তবতার দৃষ্টিতে, খ্রিষ্টের (ব্যক্তি স্বত্ত্বার) তাৎপর্যের বেশ ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় এবং পরিত্রানের ন্যায় মহা এই ঐশ্বরিক কাজটিও অন্যান্য সাধারণ কাজ বা ঘটনার মত ছোট্ট একটি ঘটনায় রূপান্তরিত হয়।"[৫]

এই জগতের স্রষ্টা, কর্তা, পরিকল্পনাকারী (এক কথায়) সকল কিছুই, একমাত্র আল্লাহ। সমস্ত মহিমা ও শক্তি কেবল তাঁরই। তিনি ব্যতীত কেউই এ জাতীয় মহত্ত্ব ও শক্তির উৎস নয়। যখনই অন্য কারো সাথে এরূপ মাহাত্ম্য এবং পবিত্রতা যুক্ত করার প্রচেষ্টা করা হয় তখনই এ সকল দৃষ্টিভঙ্গি সমগ্র মহা বিশ্বের সাথে সাংঘর্ষিক রূপ ধারন করে। ফলে সমগ্র সৃষ্টি জগতে তার আর কোন অস্তিত্বই অবশিষ্ট থাকে না।

এ কারনেই বহুশ্বরবাদের ধারনা মানব উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। (অথচ) যেখানে একেশ্বরবাদের ধারনা মানব জাতির জন্য সকল প্রকার অগ্রগতির দরজা উম্মুক্ত করে দেয়।

ইসলামের ধারণা

কুরআনের ভাষ্যমতে, মানবতার উদ্দেশ্যে প্রতিটি নবী-রাসূলদের (পয়গম্বরদের) আহ্বান ছিলো এক ও অভিন্ন। মূলত তাদের বার্তা ছিল, আমাদের এবং তোমাদের প্রভু মাত্র একজন আর একমাত্র তাঁরই উপাসনা করতে হবে।

এক ইলাহ বা প্রভুর অর্থ কি? এর অর্থ, সমগ্র সত্ত্বার মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সেই কারণে তিনি মানুষের নিকট সম্ভ্রমের পাত্র। প্রকৃতপক্ষে মানুষ যদি তার ঈশ্বরের সৃষ্টি বিষয় নিয়ে গবেষণা করে, তবে অবশ্যই তাঁর সত্ত্বার স্বরূপ তাকে শিহরিত করবে। এই ধরণের অভিজ্ঞতা স্বাভাবিকভাবে এমন একটি পবিত্রতার অনুভূতি সৃষ্টি করে যা একান্তভাবে মনুষ্য কল্পনার অতীত এক মহান স্বত্ত্বার প্রতি আরোপিত হতে পারে। আরাধনার মাধ্যমেই এই অনুভূতির স্বাভাবিক অভিব্যক্তি ঘটে অর্থাৎ মানুষ তখন সেই মহান শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে। তাঁর কাছে তখন আল্লাহই এক এবং একমাত্র ঈশ্বর। তিনি ছাড়া অন্য কোন আরাধ্য নাই এবং তাঁর কোন অংশীদারও নাই।

সত্য ঈশ্বরে বিশ্বাস হল সকল উৎকর্ষতার মূল; অসত্য ঈশ্বরে বিশ্বাস সকল অনিষ্টের মূল।

সমগ্র অনিষ্টের মূল উৎস

এসকল শিরকময় (বহুশ্বরবাদী) ধর্মবিশ্বাস (আকিদা) এর ফলে তাদের মাঝে অনেক অদ্ভুত বিশ্বাস ও কুসংস্কার তৈরি হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ,যখনই (আকাশে) বিদ্যুৎ এর চমক দেখতো, তখন তারা মনে করতো 'এটা দেবতাদের আগুনের চাবুক। আবার যখন, সূর্য ও চন্দ্র গ্রহন হতো, তখন তারা নিশ্চিতরূপে ধরে নিত যে তাদের দেবতাদের উপরে কোন বিপদ আপতিত হয়েছে। নিশ্চয় কোন অনিষ্টকর অন্ধকার শক্তি দেবতাদেরকে ঘেরাও করেছে ইত্যাদি।

ঐশ্বরিক পবিত্রতার নামে এসকল শিরকময় (বহুশ্বরবাদী) ধর্মবিশ্বাস (আকিদা) গুলি ধর্মীয় পুরোহিত, পন্ডিত এবং রাষ্ট্র নেতাদের জন্য খুব লাভজনক ছিল। তারা নিজেদেরকে ঈশ্বর ও জনতার মাঝে সংযোগের মাধ্যম হিসেবে জনতার কাছে পেশ করে তাদেরকে প্রতারণা করতো। যখন জনগণ এই ধারনাটি মেনে নিল, এই পুরোহিত শ্রেণী এবং শাসক শ্রেণী তাদেরকে শোষণ করতে শুরু করলো। তারা জনতার মাঝে এমন বিশ্বাস উপস্থাপন করলো যে, "এই পুরোহিত শ্রেণীকে সন্তুষ্ট করার অর্থই হল, প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা।"

এই মতবাদের বিস্তারের দরুন সব থেকে বেশি লাভবান হয় রাজা-বাদশাগণ। তারা জনগণের মাঝে থাকা এই বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে, (God King) দৈব রাজা বা ঈশ্বর কতৃক নির্বাচিত রাজা বিশ্বাসটি বিকশিত করে তাদেরকে প্রতারণা করে। বস্তুত যে কোন সমাজ বা রাষ্ট্রে রাজা বাদশাহদের নিকটেই সব থেকে বেশি সম্পদ এবং ক্ষমতা মজুদ থাকে। এই স্বতন্ত্র পদমর্যাদাকে ভিত্তি করে তারা জনতার মাঝে এই দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তার ঘটায় যে, তারা (শাসক) কোন স্বাভাবিক মানুষ নন (বরং দৈব গুনের অধিকারী) বরং স্বাভাবিক মানুষ থেকে ব্যতিক্রম। তারা এই পৃথিবীতে ঈশ্বর কতৃক নির্ধারণকৃত প্রতিনিধি। আবার কেউ কেউ শুধু এতটুকু বলেছে যে, তারা ঈশ্বর এবং মানুষের মাঝে থাকা সংযোগ স্থাপনকারী। কিছু মানুষ এর থেকে অগ্রসর হয়ে মানুষকে জানালো, তারা মানুষরূপে ঈশ্বরের অবতার হয়ে পৃথিবীতে এসেছে। তাদের নিকট অতিপ্রাকৃতিক শক্তি রয়েছে বা তারা অতিপ্রাকৃতিক মানব। আর এভাবেই প্রাচীনযুগে রাজা-বাদশারা তাদের রাজত্বে একক প্রভাব প্রতিষ্ঠিত রেখেছিল।

The Encyclopedia Britanica (১৯৮৪) এর মধ্যে, (Sacred Kingship) ঐশ্বরিক রাজা নামক নিবন্ধে বলা হয়েছে-একটি সময় (এমন অবস্থা তৈরি হয়েছিলো) যখন এরূপ ধর্মবিশ্বাস পূর্ণাঙ্গরূপে ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের পুরো অস্তিত্বের সাথে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিলো এবং রাজ্যগুলি বিভিন্ন ধর্মীয়শক্তি বা ধর্মীয়মতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই সময়ে এমন কোন রাজ্য এবং রাজত্ব এই পৃথিবীতে ছিল না, যা এরূপ কোন না কোন ঐশ্বরিক চেতনা ও মতাদর্শের দ্বারা পরিচালিত হতো না।[৬]

প্রাচীন বহুশ্বরবাদের ধারনাটি যখন, শাসকদেরকে ঐশ্বরিকতা ও পবিত্রতার স্থানে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করলো, তখন সমাজে দুটি বৃহৎ অনিষ্ট অনুপ্রবেশ করলো। রাষ্ট্র ক্ষমতা কতৃক আনীত অনিষ্টসমূহ তাদের চুড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেল। লর্ড অ্যাক্টন (Lord Acton-১৮৩৪-১৯০২) লিখেছেন অবাধ ক্ষমতা চুড়ান্তভাবে দুষিত হয়, যদি জনগণ শাসকদের উৎপীড়ন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ধর্ম নিরপেক্ষভাবে তাদের শাসকদের পরিবর্তন করতে না পারে তাহলে বাহ্যত যারা

ঈশ্বরের প্রতিভূরূপে বা প্রতিমূর্তিরূপে দেশ শাসন করে তাদেরকে তারা সিংহাসন চ্যুত করার কথা ভাবতে পারে কি?

এই রাষ্ট্রীয় অপশক্তি সম্পর্কে ফরাসী ঐতিহাসিক হেনরী পাইরেনী (Henri Pirenne) একচ্ছত্র সাম্রাজ্যবাদীতা (Imperial absolutism) বলে অভিমত দিয়েছেন। এই সাম্রাজ্যবাদীতা সমগ্র উন্নয়নের পথে পূর্ণ একক বাধা রূপে দাড়িয়ে যায়। ইসলাম এসে যখন এই একচ্ছত্র সাম্রজ্যবাদকে ধ্বংশ করলো, ঠিক তার পরবর্তীতেই মানুষের সকলপ্রকার উন্নয়নের দরজা ক্রমান্বয়ে উন্মুক্ত হতে থাকলো। হেনরী পাইরেনীর (Henri Pirenne) লেখা বই "History of Western Europe". এই বিষয়টি নিয়ে বহু তথ্যবহুল মুল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

হেনরী পাইরেনীর গবেষণামূলক গ্রন্থটির মূল বার্তাটি হলো, প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্য যা লোহিত সাগরের উভয় তীরেই ছড়িয়ে ছিল, তারা স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকারকে হরন করার মধ্য দিয়ে মানবজাতির উন্নয়নের দ্বারগুলি বন্ধ করে দিয়েছিল। এই প্রকার নিরঙ্কুশ সাম্রাজ্যবাদের পূর্ণ অবসান না হওয়া পর্যন্ত চিন্তা চেতনা ও বাকস্বাধীনতা অর্জন সম্ভব ছিল না। আর যতক্ষণ পর্যন্ত মানব মস্তিষ্ক স্বাধীন ভাবে চিন্তা করার সুযোগ ও পরিবেশ প্রাপ্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত মানবজাতির উন্নয়নের সূচনা হওয়া সম্ভব নয়। মানুষের মন-মস্তিষ্ক যখন গোলামীর জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে তখন তা আর মুক্তভাবে কাজ করতে পারে না। আর এই অবস্থায় অগ্রগতি ও উন্নতির সূচনা অসম্ভব।

লেখক পারস্যকেও এই একই জাতীয় সাম্রাজ্যবাদী দায়বদ্ধতার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন। আর আমাদেরকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে, এই দুটি সাম্রাজ্যই (রোম - পারস্য) তৎকালীন বিশ্বের বৃহৎ জনপদ বিশিষ্ট প্রধান সাম্রাজ্য ছিল। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অধীনে কারোরই স্বতন্ত্রতার সাথে স্বাধীন চিন্তা করার অধিকার থাকে না। দীর্ঘ সময়কালব্যপী বুদ্ধিবৃত্তি অবদমিত থাকার কারণে সেখানে কোন বৈজ্ঞানিক চেতনার উন্মেষ ঘটেনি। প্রকৃতপক্ষে পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের ভিতরে বৈজ্ঞানিক চিন্তন অনুশীলনের নৈতিক অনুমোদন ছিল না।

যখন নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণের দ্বারা স্বল্প রক্ত পাতের মধ্য দিয়ে এই দুই সাম্রাজ্যের পতন হয়, তখন বাক ও চিন্তার স্বাধীনতার সূচনা হয় এবং সকল প্রকার কল্যাণ এবং উন্নয়নের দরজা উন্মুক্ত হয়।

অনুসন্ধানের স্বাধীনতা

ব্যারন ক্যারা ডি ভক্স (Baron Carra de Vaux) এর লিখিত বই, 'The Legacy of Islam' ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হয়। এই বইটির লেখক যদিও বা আরবদের কর্মকান্ডের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন তবুও তিনি তাদেরকে গ্রীকদের ছাত্ররূপে উল্লেখ করে তাদের কৃতিত্বকে খাটো করেছেন। বার্টান্ড রাসেলও (Bertrand Russell) তাঁর লেখা 'History of Western Philosophy' নামক ঐতিহাসিক বইটিতে আরবদেরকে শুধুমাত্র গ্রীক ধ্যান ধারনা সঞ্চারকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ তারা গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুবাদের মাধ্যমে ইউরোপে সঞ্চার করেছেন।

বস্তুত ইতিহাসের দৃষ্টিকোন থেকে এই কথাগুলি মোটেই সঠিক নয়। এমনটি ভাবলে সত্যই আরবদের শিক্ষা এবং কৃতিত্বের প্রতি অবিচার করা হবে। এটি সত্য যে, আরবীয়রা গ্রিক বিদ্যা অর্জন করেছিল এবং তা থেকে উপকৃতও হয়েছিল। কিন্তু তৎপরবর্তীকালে তারা যে জিনিস ইউরোপে পৌঁছে দেয় তা তাদের গ্রীক বিদ্যা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেও বহু বহু গুন বেশি ছিল। আর এটিই ইউরোপের রেনেসাঁসের সূত্রপাত ঘটায়। ইউরোপে রেনেসাঁর সূত্রপাতকারী ধারনাগুলি গ্রীক চিন্তাধারা থেকে তৈরী হয়নি। যদি তাই হতো, তবে ইউরোপের উন্নয়ন বহু পূর্বেই হয়ে যেত। এই নব জাগরণের জন্য ইউরোপেকে হাজার বছর অপচয় করতে হতো না।

এটা সকলেরই জানা, প্রাচীন গ্রীক যে বিপ্লব ঘটিয়েছিলো, তা শুধু মাত্র শিল্প ও দর্শনের (Art and Philosophy) মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিজ্ঞানের শাখায় তাদের অর্জন এতটাই স্বল্প এবং নিম্ন মানের ছিল যে, তা গণনার মধ্যেই

পড়ে না। এই বিষয়ে তাদের একমাত্র উল্লেখ্য যোগ্য কর্মটি হলো আর্কিমিডিস (Archimedes) এর (Hydro Statics) হাইড্রোস্টাটিক্স।

এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, বৈজ্ঞানিক গবেষনা এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য চিন্তার স্বাধীনতাপূর্ণ পরিবেশের প্রয়োজন। প্রাচীন যুগে কোন একটি দেশেও এমনতর স্বাধীন চিন্তা করার মত পরিবেশ ছিল না। এমনকি গ্রীসেও ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, সক্রেটিসকে (Socrates) এথেন্সের যুবকদের মধ্যে মুক্ত মানসিকতা ও মুক্ত গবেষণায় উৎসাহ যোগানোর শাস্তি স্বরূপে হেমলক (নামক বিষ) পান করিয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা হয়েছিল। অন্য দিকে রয়েছে আর্কিমিডিস (Archmedes)। আর্কিমিডিসকে (২১২ খ্রিষ্টপূর্ব) একটি রোমান সৈন্য হত্যা করে, যখন তিনি শহরের বাইরে বালির উপরে (Geometrical) জ্যামিতিক সমস্যার সমাধান করায় ব্যস্ত ছিলেন।[৭] প্লুটার্কের (Plutarch) বর্ণনা মতে, স্পার্টার (Spartans) বাসীন্দারা শুধুমাত্র কর্মের প্রয়োজনে লিখতে এবং পড়তে শিখতো। তাদের সমাজে অন্য সকল প্রকার গ্রন্থ এবং বিজ্ঞানীদের লেখনী সমূহ পড়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত ছিলো। এথেন্সে চিত্রকলা ও দর্শনের (Art and Philosofy) উন্নতি হয়েছিল সত্য কিন্তু তারপরও তৎকালীন বহু শিল্পী এবং দার্শনিক যেমন অ্যাসকাইলাস, ইউরিপিডিস, ফিডিয়াস, সক্রেটিস এবং অ্যারিষ্টটলদের নির্বাসন, কারাদণ্ড বা প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় অথবা তারা দেশত্যাগে বাধ্য হয়।

এস্কিলাস (Aeschylas) এর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি এলুসিনিয়ান রহস্যের (যা ছিল গ্রীক চিন্তাধারার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ) গোপনীয়তা ভঙ্গ করেছেন। তৎকালীন গ্রিসে বিজ্ঞানের উন্নয়ন ও বিপ্লব ঘটানোর মত পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল না।

আধুনিক বিজ্ঞানের যুগের আগমনের পূর্বের যুগগুলিতে ইউরোপের কি অবস্থা ছিল তা জানার জন্য একটি উপমা উপস্থাপন করা হল। দ্বিতীয় পোপ সিলভাস্টার (Pope Sylvester II) যিনি সাধারণত গারবার্ট (Gerbert) নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন,

৯৪৫ সালে ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করেন আর ১০০৩ সালে মারা যান। তিনি গ্রিক ও ল্যাটিন,এই দুই ভাষাতেই যথেষ্ঠ পারদর্শী ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে গভীর পান্ডিত্বের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন।

তিনি ৯৬৭ সালে একবার স্পেনে সফর করেছিলেন এবং স্পেনের বার্সেলোনাতে তিন বছর অবস্থান করেছিলেন। সেই সময়ে তিনি আরবদের লিখিত বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ অধ্যায়ন করেছিলেন এবং তাদের লেখা পড়ে দারুণভাবে মুগ্ধ ও প্রভাবিত হয়েছিলেন। স্পেন থেকে ফিরে আসার সময় তিনি তার সাথে আরবদের লিখিতও অনুবাদকৃত কিছু পুস্তক ও একটি এস্ট্রেলেব সাথে করে নিয়ে আসেন। তিনি আরবদের লিখিত বিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা (আরবিতে মানতেক শাস্ত্র বলা হয়), গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে গবেষনা শুরু করেন। আর এজন্য তাকে কঠিন বাধা ও বিপত্তির মুখে পড়তে হয়। কিছু সংখ্যক খ্রিষ্টান পাদ্রী বলতে থাকে যে, গারবার্ট স্পেনের মুসলিম থেকে যাদুবিদ্যা শিখে এসেছে। আবার কিছু মানুষ বলা শুরু করে, তার উপর শয়তান ভর করেছে। এমনতর চলমান পরিস্থিতির মধ্যে মে মাসের ১২ তারিখে ১০০৩ সালে রোমে তার মৃত্যু হয়।"[৮]

ইসলাম আগমনের পূর্বে, সংগৃহীত সমগ্র মানব ইতিহাসের পাতা দৃষ্টিপাত করলে স্পষ্ট দেখা যায়, সে সময় গুলিতে বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতার অস্তিত্বই ছিল না। আর এর ফলেই প্রাচীন যুগগুলিতে বৈজ্ঞানিক চিন্তন সংক্রান্ত বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা বা হাতেগোনা কিছু উদাহরণ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। আর ঐ সমস্ত বৈজ্ঞানিক চিন্তন গুটি কতক ব্যাক্তি মানসেই সীমাবদ্ধ ছিল। চিন্তা ও গবেষণার স্বাধীনতা না থাকার দরুণ এমন হাজারো চিন্তা ও গবেষণাকারীর জন্ম হলেও তা বিলিন হয়ে গিয়েছে।

ইসলামই সর্ব প্রথম এই পরিবর্তনের জন্য বিপ্লব শুরু করে এবং ধর্মীয় জ্ঞান এবং প্রাকৃতিক জ্ঞানকে (Physical Knowledge) একে অপরের থেকে পৃথক করে। ধর্মীয় জ্ঞানের উৎস হিসেবে স্রষ্টাপ্রদত্ত স্বর্গীয় বাণী (যার বিশদ প্রমানপুষ্ট

এবং বিশুদ্ধ সংস্করণ হিসেবে আল কুরআন রূপে সংরক্ষিত রয়েছে) সাধারণভাবে স্বীকৃত হতো। যার সংরক্ষণ ও স্থায়িত্বের ভার স্বয়ং আল্লাহ নিয়েছেন। অন্য দিকে প্রাকৃতিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইসলাম সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেছিল যাতে কোন ব্যাক্তি স্বাধীনভাবে তার নিজস্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে।

হাদিস শাস্ত্রের মধ্যে দ্বিতীয় বিশুদ্ধ ও প্রামান্য গ্রন্থ হলো ইমাম আল মুসলিম (রহঃ) সংকলিত গ্রন্থ সহিহ আল মুসলিম। এখানে একটি অধ্যায় লিখিত রয়েছেঃ "শরীয়ত (অনুশাসন) হিসেবে পয়গম্বর (সা:) যা আদেশ করেছেন তা অবশ্য পালনীয় আর পার্থিব বিষয়ের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।"[৯]

এই অধ্যায়ে ইমাম মুসলিম (রহঃ) একটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন যা মুসা ইবনে তালহা তার পিতাকে প্রামাণ্য ব্যাক্তি হিসাবে উপস্থাপন করে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছিলেন - " আমি একবার নবী (সঃ) এর সঙ্গে ছিলাম যখন তিনি কিছু লোকদের অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। তারা তখন খেজুর গাছের শীর্ষে আরোহণ করেছিল। তারা কি করছিল সে বিষয়ে নবী (সঃ) খোঁজ নিলেন। তারা তাকে জানাল যে পুরুষ ও স্ত্রীফুল স্পর্শ করে তারা গাছগুলির পরাগমিলন ঘটিয়ে গর্ভনিষেক করছে। নবী (সা:) তখন বললেন, " আমার মনে হয় এতে তাদের কোন লাভ হবে না।" যখন তারা নবী (সঃ) এর কথা শুনতে পেল তারা তখন পরাগমিলন করা বন্ধ করল। সে বছর খুব অল্প ফলন হল। যখন নবী (সা:) ঘটনাটি জানতে পারলেন, তিনি বললেন যদি তারা পরাগ সংযোগ করে উপকৃত হয় তাহলে অবশ্যই তারা ঐ কাজ চালিয়ে যাবে। আমি কেবল অনুমান করেছিলাম, এটা আমার একটি অভিমত ছিল মাত্র। এই ধরনের ব্যাপারে আমার অভিমত অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই। তবে স্রষ্টা সম্পর্কে যদি আমি কিছু বলি, তা অবশ্যই মেনে চলতে হবে; কারণ ঈশ্বর সম্পর্কে আমি কখনো অসত্য বলি না।

এই একই ঘটনা নবী (সা:) এর স্ত্রী আয়েশা এবং তাঁর আজীবন সঙ্গী সাবিত ও আনাস বর্ণনা করে বলেছেন। সবশেষে তিনি ঐ খেজুর উৎপাদনকারীদের ডেকে তাদের নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণ করার কথা বলেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, 'তোমাদের বিষয়টি তোমরাই ভালো জানো।'

এই হাদিস অনুসারে একথা পরিষ্কার, ইসলাম ধর্মীয় বিষয় ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়কে একে অপরের থেকে পৃথক করেছে। ধর্মীয় ক্ষেত্রে ঐশ্বরিক নির্দেশনাকে আবশ্যিকভাবে মানতে হবে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে মানুষের অভিজ্ঞতা অনুসারে তাদের কর্মকান্ড পরিচালিত হবে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই বিষয়টি এক মহাবিপ্লব হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

আরবীয় প্রভাব

এটি সত্য যে, প্রাচীন যুগে বিভিন্ন দেশে নির্দিষ্ট কিছু মহান ব্যক্তির আগমন ঘটেছিল যারা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ভাবে বেশ কিছু সফলতা অর্জন করেছিল। তবে প্রতিকূল পরিস্থিতি আর অসহযোগীতার কারনে, তাদের অনুসন্ধানগুলি নিজের দেশে বা বহির্বিশ্বে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে নি।

ফরাসি ঐতিহাসিক "মোসোলেবান (Moseoleban) তাঁর লেখা 'The Arab Civilization' নামক বইতে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেন:প্রাচীন যুগে বহু দেশ ও জাতি অন্যান্য দেশ ও জাতির উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। ইরান, গ্রিক ও রোম দীর্ঘ সময় ধরে পূর্বের রাষ্ট্রগুলিকে জয় করে শাসন করেছে। কিন্তু ঐ সকল দেশ গুলির উপর তাঁদের সাংস্কৃতিক প্রভাব খুবই কম ছিল। বিজয়ী জাতিগুলি তাদের অধীনস্থ জাতিগুলির মাঝে, তাদের ধর্ম, তাদের ভাষা, তাদের বিজ্ঞান অথবা তাদের শিল্পের স্থাপন ও প্রসার ঘটাতে পারে নি। রোমান শাসনের যুগে মিশরীয়রা শুধুমাত্র তাদের প্রাচীন ধর্মই আঁকড়েই রাখেনি বরং বিজয়ী সভ্যতাগুলি নিজেই পরাভুতদের ধর্ম ও নির্মান কৌশল রপ্ত করেছিল। উক্ত সময়ে (রোমে) নির্মিত তাদের ইমারত গুলি লক্ষ্য করলে স্পষ্ট বোঝা যায় সেই সকল স্থাপত্যের নির্মানের কলা কৌশল ফ্যরাওদের নির্মিত স্থাপত্যের কলা কৌশলের উপর ভিত্তি করে নির্মিত।

তবে যে লক্ষ্যটি গ্রিক,ইরান এবং রোমানগণ মিশর থেকে অর্জন করতে ব্যর্থ হয়, সেই লক্ষ্যটি আরবীয় মুসলিমগণ অতি দ্রুত এবং কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা

ছাড়াই অর্জন করতে সক্ষম হয়। যে মিশর তার হাজার বছরের সংস্কৃতি ও সভ্যতা ধারণ করে আসছিল এবং যাদের সেই প্রাচীন কৃষ্টি কালচার থেকে দূরে রাখা বা অন্য সভ্যতার কৃষ্টি কালচার গ্রহন করা প্রায় অসম্ভব ছিল, তারাই মাত্র এক শতাব্দীর ব্যবধানে নিজেদের সেই সাত হাজার বছরের পুরনো কৃষ্টি-কালচারকে ছেড়ে দিয়ে ইসলাম নামক একটি নতুন ধর্ম এবং একটি নতুন ভাষাকে আপন করে নিয়েছিল। আরবীয়দের এই একই প্রভাব আফ্রিকা, সিরিয়া, ইরান সহ অন্যান্য দেশ ও সভ্যতার উপর কায়েম করতে সক্ষম হয়। তাদের মাঝে অতি দ্রুততার সহিত ইসলামের বিস্তৃতি ঘটে। (আরও মজার কথা হল) এই আরবদের শাসন ও রাজত্ব যে সকল দেশে (আজ অবধিও) প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তারা শুধু সেখানে বাণিজ্যের জন্য গমণ করেছিল, সেই সকল দেশ ও জাতির মাঝেও ইসলামের বিস্তার ঘটে, উদাহরণ হিসেবে আমরা চীনকে দেখতে পারি।

সমগ্র ইতিহাসের পাতায় পরাজিত জাতির উপর কোন বিজয়ী জাতির বা দেশের এমন প্রভাব কখনোই পরিলক্ষিত হয়নি। ঐ জাতিগুলি, যাদের সাথে আরবীয় মুসলিমদের সম্বন্ধ খুব স্বল্প দিনের ছিল, তারাও তাদের সেই মহৎ ও ঐশ্বরিক বার্তার দ্বারা গঠিত সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে গ্রহন করে নিয়েছিল। এমন কি মুসলিমদের উপর বিজয়ী জাতিগুলির ক্ষেত্রেও এই একই দৃশ্য দেখতে পাই। উদাহরণস্বরূপ, তুর্কি ও মুঘলরা মুসলিমদের পরাজিত করার পরে তারা শুধু ইসলাম ধর্ম এবং আরবীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিল তাই নয়, তারা তাদের একনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে ছিল। আজও যখন অ্যাটলান্টিক সাগর থেকে নিয়ে সিন্ধু পর্যন্ত এবং ভুমধ্য সাগর থেকে নিয়ে আফ্রিকার বালুকাময় মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে আরবীয় সভ্যতার প্রানবন্ততা কিছুটা ম্রিয়মাণ হয়েছে, তখনও একটি ধর্ম, একটি ভাষা আজও সমাদৃত হয়ে আছে এবং তা হল ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ধর্ম এবং তাঁর ভাষা।[১০]

মোসোলেবান আরও লেখেন, পশ্চিমা দেশগুলোতে আরবদের যেরূপ প্রভাব ছিল, পূর্বের দেশগুলোতেও একই রকম প্রভাব ছিল। পশ্চিমা জাতিগুলি

আরবদের নিকট থেকে তাদের সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে। পূর্বের দেশগুলিতে তাদের ধর্ম ও ভাষা থেকে শুরু করে তাদের চিত্রকলা হস্তশিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরবীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পশ্চিমা দেশগুলিতে তাদের ধর্ম, হস্তশিল্প ও উৎপাদন শিল্প তেমনভাবে প্রভাবিত হয় নি, তাদের শিল্পকলা ও বিজ্ঞান অধিকমাত্রায় প্রভাবিত হয়েছে।

এই আরবদের দ্বারাই একত্ববাদী ধর্ম এবং এর প্রভাবে সৃষ্ট সংস্কৃতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং তা বিশ্বের সকল প্রাচীন প্রধান জনপদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাদের প্রতিষ্ঠিত পরিবেশ ও সমাজকে উপড়ে ফেলে এমন এক পরিবেশ উপহার দেয় যা বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং দৃশ্যত প্রকৃতি নিয়ে বিশ্লেষণের জন্য অনুকুল এবং স্বাধীনতাপূর্ণ ছিল।

আধুনিকতার দিকে চারটি পদক্ষেপ

ইসলামের মাঝে মানুষ এক সত্য ও অবিকৃত ধর্মমতের সন্ধান পেয়েছে, যা প্রকৃত অর্থে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সকল প্রকার কৃত্রিম বেড়াজাল চিরদিনের জন্য মুছে দিয়েছে। ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ সমূহ-কুরআন এবং সুন্নাহ (নবী সা: অনুসৃত সকল ক্রিয়া-কলাপ সমূহ) হলো দুইটি আলোক স্তম্ভ স্বরূপ, যা সর্বকালের মানুষের জন্য নির্দেশনার আলোকরশ্মি বিতরণ করে চলেছে।

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে একাধিকবার এই বিষয়টির উপর জোর দেওয়া হয়েছে যে, মানবতার জন্য ইসলাম রূপে যে দ্বীন (ধর্মমত) উপহার দেওয়া হয়েছে তা মানুষের জন্য যেমন ধর্মীয় অর্থে পথনির্দেশনা, ঠিক তেমনই ভিন্নার্থে আশীর্বাদ স্বরূপ (সূরা আল আনআম,আয়াত (বাক্য) ১৫৭)। এই আশীর্বাদ এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল-ইসলাম মানব ইতিহাসকে অন্ধকার যুগ থেকে মুক্ত করে এক আলোকময় যুগে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। এটা চিন্তার জগতে এমন একটি বিপ্লব নিয়ে এসেছে, যার ফলে গণনাতীত পার্থিব কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে, যার বর্ণনা পশ্চিমা লেখক হেনরি পাইরেন তাঁর ভাষায় লিখেছেন, "ইসলাম পুরো

বিশ্বের রূপ পরিবর্তন করে দিয়েছে এবং সকল প্রকার প্রাচীন ট্রাডিশনকে মূলোৎপাটিত করেছে।"[১১]

বর্তমান যুগে যাকে আমরা আধুনিক ও উন্নয়নের যুগ বলে বিবেচনা করি তা বিজ্ঞান এবং শিল্পের যুগ বা স্বাধীনতা এবং সাম্যর যুগ যাই হোক না কেন তা মূলত ইসলামের বিপ্লবের ঐ দিকেই আলোকপাত করে যাকে কুরআন আশীর্বাদ বলে ব্যক্ত করেছে। এই আধুনিক সময় কালটি অন্যান্য সকল ঐতিহাসিক ঘটনার মত ক্রমান্বয়ে বা পর্যায়ক্রমে বিকশিত হয় এবং তা চূড়ান্ত স্থানে পৌঁছাতে প্রায় এক হাজার বছর লেগে যায়।

এই ধীর প্রক্রিয়াটিকে যদি আমরা যুগ হিসেবে ভাগ করি তবে তা বৃহৎ চারটি অংশে বিভক্ত করা যায়। এই চারটি ভাগের প্রথম তিনটি ভাগ সরাসরি ইসলামী বিপ্লবের সাথে সংযুক্ত এবং সর্বশেষ বা চতুর্থ ভাগটি পরোক্ষ ভাবে সম্পর্কযুক্ত।

১. নবী মুহাম্মদ (সা:) এর যুগ ঃ ৬১০ থেকে ৬৩২;
২. খোলাফায়ে রাশেদীন বা চার খলিফার যুগ ঃ ৬৩২ থেকে ৬৬১;
৩. উমাইয়া এবং আব্বাসিয়ার যুগ ঃ ৬৬১ থেকে ১৪৯২(স্পেন পর্যন্ত);
৪. ইউরোপের আধুনিক বিপ্লবের যুগ যা ক্রুসেড যুদ্ধের পর স্পেনের মুসলিম সভ্যতার প্রভাবে ১৫ শতকের দিকে শুরু হয়।

আধুনিক মানব

বর্তমান শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত আধুনিক বিশ্বে সাধারণত মনে করা হত যে, উন্নতির গোপন রহস্য হল, মানুষকে গতানুতিক প্রথা বা ঐতিহ্য থেকে বের করে আধুনিকতায় পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু মানুষ তার নির্ধারিত গন্তব্যে পৌঁছানোর পর আবার হতাশার কবলে পতিত হলো। তারা অনুভব করলো যে, মানুষের প্রকৃত উন্নতির জন্য এর থেকে আরও অধিক গভীর এবং মজবুত দার্শনিক ভিত্তির প্রয়োজন। সাম্প্রতিক কালে 'Shallow are the Roots' ইত্যাদি শিরোনামে এই বিষয়ের উপর নানান নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

এখন পশ্চিমা দেশীয় লেখকগণ এই বিষয়টি গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করেছেন। এই বিষয়ের উপর রচিত একটি বই, প্রফেসর.উইলিয়াম ই. কনোলি (William E. Connolly) এর 'Political Theory and Modernity'। প্রফেসর কনোলি তার গ্রন্থে লিখেছেন,

"আধুনিকতার এই পুরো প্রকল্পটির অত্যাশ্চর্যজনক সাফল্য সত্ত্বেও এটি যথেষ্ট পরিমান সমস্যা যুক্ত। আর এর কারন হলো, প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরুর দিকে মানুষের হৃদয় ও প্রবৃত্তির যে স্থান জুড়ে ঈশ্বর থাকেন, সে স্থানটি (নাস্তিকতা দ্বারা) জোর পূর্বক খালি রাখতে বাধ্য করা হয়। অতঃপর সেই স্থানটি যুক্তি, জনতার ইচ্ছা, দ্বান্দ্বিক ইতিহাস দ্বারা পূর্ণ করার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তারা প্রত্যেকেই চুড়ান্ত নাস্তিবাদে পৌঁছানোর দ্বারা বিষয়টির অবসান ঘটে।[১২]

ইসলামের পূর্বের যুগটি ছিলো বহুশ্বরবাদের আস্তরণে বন্দী অন্ধকার যুগ। ঐ যুগের মানুষদের মেধা ও মনন বহুশ্বরবাদের চেতনা দ্বারা আচ্ছাদিত ছিলো। সকল সৃষ্টবস্তু স্রষ্টার স্থান গ্রহন করে রেখেছিলো। মানুষ অগণিত দেবতার পূজারীতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিলো। আর যার ফলস্বরূপ, তাদের চিন্তাভাবনা বিকৃত হয়ে পড়ে। ফলে উন্নয়ের সকল দরজা রুদ্ধ হয়ে যায়।

ঠিক এমনই একটি সময় ইসলামের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ইসলামের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল, বহুশ্বরবাদের অবসান ঘটানো, তদীয় স্থানে একেশ্বরবাদকে প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামের পয়গম্বর মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সন্মানিত সাথীদের মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে বহুশ্বরবাদের চিরপরিসমাপ্তি ঘটে এবং একেশ্বরবাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। একেশ্বরবাদ বিজয়ীর আসন অলঙ্কৃত করে। এই বিপ্লব এত সুদূর প্রসারী ছিল যে এই একেশ্বরবাদী যুগ এক হাজার বছর যাবত তার আপন শক্তিমত্তাসহ প্রতিষ্ঠিত থাকে। তারপর নব্য যান্ত্রিক সভ্যতার আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই নব্য সাংস্কৃতিক বিপ্লব মূলত ইসলামী বিপ্লবের প্রভাবের দ্বারাই পশ্চিম ইউরোপে সংঘটিত হয়। অতঃপর তার প্রভাব সমগ্র বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। এই সভ্যতার নেতিবাচক দিকটি হ'ল বস্তুবাদের উপর জোর দেওয়া এবং অন্য সমস্ত বিষয়কে বাদ দেওয়া। আর এর ইতিবাচক দিকটি হ'ল ইসলামী বিপ্লবের ধারাবাহিক প্রভাবে মানবচিন্তার শৃঙ্খল মোচন।

অগ্রগতির দিকে যাত্রা

খ্রিস্টের আবির্ভাবের পূর্বে মানবসভ্যতার চারটি প্রধান কেন্দ্র হলঃ গ্রীস, পার্সিয়া (ইরানের প্রাচীন নাম), চীন এবং ভারত। ইসলামের মহান নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাবের পর আব্বাসীয় খলিফা আল মানসুর ৭৬২ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদ নামক একটি শহর স্থাপন করেন। তিনি দূর দূরান্তে অবস্থিত ধর্মীয় পন্ডিত এবং বুদ্ধিজীবিদেরকে বাগদাদে আগমনের আমন্ত্রণ জানান। তিনি বিভিন্ন ভাষার বই আরবী ভাষায় অনুবাদ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতায় এই অনুবাদের কাজ পথ চলতে শুরু করে। ৮৩০ বা ৮৩২ খ্রিস্টাব্দে খলিফা আল মামুন বাগদাদে 'বায়তুল হিকমাহ' (জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র) প্রতিষ্ঠা করেন। তার সাথেই তিনি একটি জ্যোতির্বিজ্ঞান পর্যবেক্ষন কেন্দ্র, একটি গ্রন্থাগার, একটি শিক্ষাকেন্দ্র আর একটি অনুবাদ পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন। অনুবাদের কার্য এত দ্রুততার সাথে ও বিস্তৃত পরিসরে চলমান ছিল যে,বাগদাদ শহর প্রতিষ্ঠার মাত্র আশি বছরের ভেতরেই গ্রিক ভাষায় রচিত অধিকাংশ গ্রন্থ আরবিতে অনুদিত হয়ে যায়।

আব্বাসীয় যুগে কাগজ বৃহৎ পরিসরে উৎপাদিত হত, ফলে লেখনীর কাজে কাগজের কোন অভাব হতো না। দশম শতাব্দীতে স্পেনের রাজধানী কর্ডোভার(Cordova) গ্রন্থাগার গুলিতে চার লক্ষেরও অধিক বই মজুদ ছিল। ক্যাথলিক এনসাইক্লোপিডিয়ার (Catholic Encyclopedia) তথ্য অনুসারে, "ক্যান্টারবেরি লাইব্রেরি (Canterbury Library) তেরো শতকে মাত্র এক হাজার আট শত বই নিয়ে সমগ্র ইউরোপে অবস্থিত গ্রন্থাগার গুলির মধ্যে শীর্ষে অবস্থান করছিল।

আল মামুনের জ্যোতির্বিজ্ঞানগণ ভূপৃষ্ঠের দৈর্ঘ্য পরিমাপ বিষয়ক ভূগণিত সংক্রান্ত এক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কার্য পরিচালনা করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর আকৃতি নির্ণয় করা এবং গোলাকার পৃথিবীর পরিধি পরিমাপ করা। এই জরিপের কাজ ইউফ্রেটিসের উত্তর দিকে সিঞ্জার সমভূমিকে এবং পালমিরাতে

সংঘটিত হয়েছিল এবং নির্ণিত হয়েছিল যে মধ্যরেখার উপর ১ ডিগ্রির দূরত্ব ৫৬২ আরবী মাইল যা ঐ স্থানের প্রকৃত দূরত্ব থেকে মাত্র ২৮৭৭ ফুট বেশি ছিল। পৃথিবীর পরিধি নির্ণীত হয় ২০৪০০ মাইল আর ব্যাস ৬৫০০ মাইল। এই জরিপের কাজে আরো যারা অংশগ্রহণ করেন তারা হলেন মুসা ইবনে সাকিবের পুত্রগণ এবং খাওয়ারিজমী, যাদের নির্ঘণ্টটি দেড়শত বৎসর পর স্পেনের জ্যোতির্বিজ্ঞানী মাসলামা আল মাজরিতি পুনঃপরীক্ষা করেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বিভিন্ন গবেষণার কাজে এক প্রামাণ্য দলিল হিসেবে এটি ব্যবহৃত হতে থাকে। দ্বাদশ শতকের মধ্য ভাগে 'আল ইদরীস' পৃথিবীর একটি মানচিত্র তৈরি করেন। ঐ মানচিত্রটিতে তিনি নীল নদের উৎপত্তি স্থানটিকে চিহ্নিত করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, যা ইউরোপীয়রা উনবিংশ শতকে গবেষণা করে জানতে পারে।

যখন সমগ্র ইউরোপ ভাবতো পৃথিবী চ্যাপ্টা তখন মুসলিমগণই সর্ব প্রথম তাদেরকে পৃথিবী গোলাকার বা ডিম্বাকৃতির হওয়ার তথ্যটি প্রদান করে।

টলেমী (Ptolemy) ২য় শতকের গ্রিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনিই প্রথম তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আল মাজেস্ট (Al-majest) এ সৌরজগৎ এর পৃথিবী কেন্দ্রিক তত্ত্বটি উপস্থাপন করেছিলেন। টলেমির এই মতাদর্শটি প্রায় পনেরো শত বছর ব্যাপী সমগ্র বিশ্বজুড়ে মানুষের মনে আধিপত্য বিস্তার করে ছিল। অতঃপর ষোড়শ শতাব্দীতে কোপারনিকাস (Copernicus), গ্যালিলিও (Galileo), এবং কেপলার (Kepler), গবেষণা চালিয়ে শেষ পর্যন্ত টলেমীর গবেষণাকে ভুল প্রমানিত করেন। মুসলিমরাই সর্বপ্রথম ইউরোপকে এই ধারণা পরিবেশন করে যে পৃথিবী গোলাকার এবং জোয়ার ভাটার কারণ সংক্রান্ত প্রায় নির্ভুল তথ্য প্রদান করে।

এত দীর্ঘ সময় ধরে পৃথিবী সম্পর্কে এই ভুল মতাদর্শে স্থায়ী থাকার মুল কারন অনৈশ্বরিক (ঈশ্বর নয় এমন) বস্তুকে ঐশ্বরিক বা পবিত্র জ্ঞান করা। খ্রিস্টানদের বিশ্বাস ছিল যে, পৃথিবী একটি ঐশ্বরিক গুন সম্পন্ন পবিত্র স্থান, কারন পৃথিবী হলো ঈশ্বর পুত্র মসীহের জন্মস্থান। এই বিষয়টি সম্মুখে রেখে,

তাদের ধর্মবিশ্বাসের কারণে তারা ভাবতো পৃথিবী কেন্দ্রে অবস্থান করছে এবং সমগ্র সৃষ্টিকূল তাকে প্রদক্ষিণ করছে। পৃথিবী ঐশ্বরিক ক্ষমতা সম্পন্ন - এই ধারনার বশবর্তী হয়ে খৃষ্টানগণ এই বিষয়ে অধিক গবেষণা কর্মে বাধা সৃষ্টি করেছিল। এই তত্ত্বের উপর তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মজবুত ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না বাস্তবতার ঝড় মহা শক্তি নিয়ে তাদের উপর আঘাত না করে এবং মানতে বাধ্য না করে।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে (১৯৮৪) লেখা রয়েছে,

"প্রাচীন মহাবিশ্বতত্ব অনুসারে পৃথিবী সমগ্র সৃষ্টিজগতের কেন্দ্রে অবস্থিত ছিল, মানুষ হল এই পৃথিবীর সর্ব উৎকৃষ্ট ও সর্ব শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং ঈশ্বরপুত্রের মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে প্রায়শ্চিত্তের মতো ঐশ্বরিক কার্যটিও আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদাময় শ্রেষ্ঠতর ঘটনা। অতঃপর আবিষ্কার হলো, পৃথিবীও শূন্যে ভ্রমণরত অন্যান্য গ্রহ গুলোর মধ্যে একটি ছোট্ট ভ্রমনরত গ্রহ যা সূর্যকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করছে, এবং এই মহাবিশ্বের অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জের (Galaxies) মধ্যে সূর্যও একটি নগন্য নক্ষত্রমাত্র। এই আবিষ্কার মানুষের ঐ সকল প্রাচীন খ্রীষ্টিয় মতাদর্শকের উপর প্রচন্ড ভাবে আঘাত হানে। পৃথিবী প্রকান্ড বিস্তৃততর মহাশূন্যের সকল সৃষ্টির তুলনায় ছোট্ট একটি ধুলিকনার সমতুল্য। (বিষয়টি অবলোকন করে) নিউটন সহ অন্যান্য বিজ্ঞানীরা এই প্রশ্নের উত্তর প্রাপ্তির জন্য অনুসন্ধান কার্য শুরু করেন, যে মানুষ হল (মহাশূন্যের তুলনায়) ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র বালুকণা তুল্য। সুতরাং সেই মানুষ কিভাবে এমন দাবি করতে পারে যে সে এমনতর ঐশ্বরিক পবিত্রময় মর্যাদার অধিকারী যে, সে এবং তার অবস্থানই হল স্রষ্টার চুড়ান্ত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য।" [১৩]

খ্রিষ্টানগণ হযরত মসীহকে (আ.) পবিত্র ঈশ্বরের তিন অংশের (ট্রিনিটির) একটি অংশ হিসেবে গ্রহন করে এবং তাদের এই ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি থেকে এমন কথার স্বীকৃতি ঘটে যে, "মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্যের জন্য ঈশ্বরের পুত্রের ক্রুশকাঠে আত্মত্যাগ, বিশ্ব ইতিহাসে সংঘটিত সর্ব বৃহৎ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।"আর এভাবেই তাদের নিকট এই পৃথিবী এক মর্যাদাপূর্ণ স্থানে রূপান্তরিত হয়।

পৃথিবীর কেন্দ্রীয় অবস্থান সম্পর্কিত ধারনার জন্য মর্যাদা হানিকর এমন কোন মতবাদকে তারা তীব্র ভাবে বিরোধিতা করতো। খ্রিস্টান পাদ্রীদের এই বিশ্বাসই সূর্যকে নিয়ে স্বাধীন ভাবে গবেষণার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

আর এভাবেই অনৈশ্বরিক বস্তুকে ঐশ্বরিকতার স্থানে বসানোর ফলে প্রাচীণ যুগে সকল উন্নয়নের গতি স্তিমিত হয়ে যায়। চাঁদকে ঐশ্বরিকতার স্থানে বসানো মানে তাকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করাকে সুক্ষ্ম ভাবে অনুৎসাহিত করা। এজন্যই তৎকালীন সময়ে চন্দ্র দেবতার উপর পা রাখার কথা কেউ কল্পনাও করতো না। সাগর এবং নদীকে দেবতার স্থানে স্থাপিত করার দরুণ এমন এক অদৃশ্য মানসিক প্রতিবন্ধকতা প্রতিষ্ঠিত হল, যার ফলে তাদের মন-মানসিকতা কখনই চাইলো না যে, নদীর জলকে ব্যবহার করে তা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হোক। গরুকে দেবতার স্থানে বসিয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হল যে, কোন মানুষ যেন এর প্রোটিন সমৃদ্ধ মাংস নিয়ে গবেষণা করতে বা তাদের খাদ্য তালিকায় স্থান দিতে না পারে। এরূপ সকল প্রকার গবেষণা এবং বিশ্লেষণের সুচনা ঐ সময়ই সম্ভব হয়েছে যখন এসকল প্রাকৃতিক বস্তুগুলিকে দেবতার স্থান থেকে সরানো সম্ভব হয়েছে যাতে করে মানুষ তাঁর স্বাভাবিক প্রাত্যহিক জীবনের অন্যান্য বস্তুর মতো তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

ইসলামের পূর্বে তারকা এবং নক্ষত্র গুলোকে উপাসনা বস্তু হিসেবে মান্য করা হতো। ইসলামী বিপ্লবের পর মুসলিমরাই সর্ব প্রথম মান-মন্দির স্থাপন করে এসকল বিষয় নিয়ে গবেষনা শুরু করে ও তারাই এসকল বিষয়কে সর্ব প্রথম গবেষণার বস্তুতে পরিনত করে। ইসলাম আগমনের পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীর অভ্যন্তরে অবস্থিত ধনসম্পদ গুলোকেও ঐশ্বরিকতার দৃষ্টিতে দেখা হতো। মুসলিমরাই প্রথম রসায়ন বিজ্ঞানের (Chemistry) বিকাশ ঘটিয়ে, তাদেরকে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যবহার করে। তখনও পর্যন্ত তারা এই পৃথিবীকে ঈশ্বর হিসেবে মান্য করতো। যেমন তৎকালীন যুগের মানুষ মহাকাশকে পুরুষ দেবতা এবং ভুমিকে নারী দেবতা হিসেবে জানতো, মুসলিমগণই সর্ব প্রথম তার ব্যাস ও পরিধি পরিমাপ করে। সমুদ্রকে তারা শুধু পূজনীয় হিসেবে জানতো। মুসলিমরাই সর্ব প্রথম তাকে

বিস্তৃত সড়কের ন্যায় ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভুমিকা পালন করে। ঝড়-তুফানকে মানুষের উপর ভর করা অদৃশ্য রহস্যময় শক্তি মনে করা হতো। মুসলিমরাই সর্ব প্রথম এই বায়ুকে ব্যবহার করে বায়ু চালিত কল (Windmill) তৈরি করে এবং এসকল ধারনার আমূল পরিবর্তন করে দেয়।

অনুরূপ ভাবে অসংখ্য রহস্যময় গল্প বৃক্ষের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। আর এজন্যই বৃক্ষকে শ্রদ্ধা,ভক্তি ও উপাসনা বস্তুতে পরিনত করা হয়েছিল। মুসলিমরাই সর্বপ্রথম সকল প্রকার গাছপালা নিয়ে গবেষণা করে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের সংকলন গুলিতে কমপক্ষে আরও দুই হাজার প্রজাতির নাম সংযোজন করে।

সকল নদ-নদীকে মানুষ ঐশ্বরিক জ্ঞান করতো, আর সেই সকল তথাকথিত ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে তারা তাদের পুত্রসন্তান এবং কন্যা সন্তানকে বলি দিয়ে অথবা ডুবিয়ে দিয়ে উৎসর্গ করতো। মুসলিমরাই সর্বপ্রথম সেই সকল নদ-নদী থেকে খাল খনন করে ঝরনা সৃষ্টি করে কৃষি সিঞ্চন কাজে ব্যবহার করে। আর এর দ্বারা কৃষি ক্ষেত্রে নব এক যুগের সূচনা হয়।

ঐ যুগে মুসলিমরা অন্যান্য জাতি হতে বিজ্ঞান গবেষণায় বেশি অগ্রগামী ছিল। তারা যখন স্পেন থেকে বিতাড়িত হল, তখন তারা অ্যাস্ট্রোল্যাব ফেলে রেখে যায় যার সহায়তায় তারা মহাকাশ, গ্রহ নক্ষত্র বা জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতো। ফেলে যাওয়া সেই সকল অ্যাস্ট্রোল্যাব তৎকালীন খ্রিস্টানদের কাছে ছিলো একেবারেই অজানা। তার ফলশ্রুতিতে তারা সে সকল অ্যাস্ট্রোল্যাব গুলোকে চার্চের টাওয়ারে রূপান্তরিত করে।

এটি চিরন্তন সত্য যে প্রাচীন যুগে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে বহুশ্বরবাদ এবং কুসংস্কারের ছড়াছড়ি ছিল। তেমনই এটিও বাস্তব সত্য যে, এসকল বহুশ্বরবাদ এবং কুসংস্কার সকল প্রকার অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইসলাম আগমনের দ্বারা একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এই একেশ্বরবাদই সর্বপ্রথম বহুশ্বরবাদ এবং কুসংস্কারকে প্রায় পূর্ণাঙ্গ ভাবে অবসান ঘটাতে সক্ষম হয়। অতঃপর স্বাভাবিক ভাবেই সেদিন থেকেই মানব ইতিহাস উন্নয়নের রাজপথে পথ চলা শুরু করে।

প্রাচীনযুগগুলিতে, নির্দিষ্ট কিছু দেশ ও জাতির অভ্যন্তরে মুক্ত চেতনার কিছু মানুষের জন্ম হয়েছিলো, তারা তৎকালীন পরিস্থিতি থেকে আলাদা ও স্বাধীন ভাবে চিন্তাভাবনা করতো। কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশের কারনে তাদের প্রচেষ্টাগুলিকে কার্যকরীরূপ দান করতে পারে নি। তাদের জ্ঞানের মুকুলগুলি প্রস্ফুটিত হওয়ার পূর্বেই শুকিয়ে ঝরে যায়। যখন ইসলামী বিপ্লব অনুকূল পরিবেশ তৈরি করলো, কুসংস্কারের বদ্ধ জলাশয় জ্ঞানের প্রবল বন্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

শিক্ষা অর্জন এবং ইসলাম

দ্বিতীয় টলেমী (Ptolemy-ll) খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট (Alexander the Great) এর পরে মিশরের শাসক রূপে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তিনি জ্ঞানের এক মহা পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি আলেকজান্দ্রিয়াতে (Alexandria) একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেছিলেন। সেখানে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রায় পাঁচ লক্ষ বই ছিল। এটিই সেই সংগ্রহশালা যা ইতিহাসের পাতায় 'The Great Library of Alexandria' নামে প্রসিদ্ধ।

এই গ্রন্থাগারটিকে কেন্দ্র করে একটি মিথ্যা অভিযোগ করা হয় যে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাযি.) গ্রন্থাগারটি পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এটি চতুর্থ শতাব্দীতে, অর্থাৎ ইসলামের আগমনের অনেক পূর্বেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার মতে, গ্রন্থাগারটি খ্রিঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে আলেকজান্ডারের শাসনকালের অবক্ষয় থেকে রক্ষা পায় এবং রোমান শাসনকালে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত এর অস্তিত্ব বজায় ছিল।[১৪]

প্রকৃতপক্ষে, ঐ গ্রন্থাগারটির অর্ধেক অংশ ৪৭ খ্রিস্টপূর্বে জুলিয়াস সিজার পুড়িয়ে দিয়েছিল। খ্রিস্টাব্দ তৃতীয় শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়ায় খ্রিস্টান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত গ্রন্থাগার সম্পর্কে এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকায় বলা আছে, "খ্রিস্টাব্দ তৃতীয় শতাব্দীর এক গৃহযুদ্ধের সময় মূল যাদুঘর এবং গ্রন্থাগারটি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল এবং ৩৯১ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান সম্প্রদায় উক্ত গ্রন্থাগারের অবশিষ্টাংশও আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়।"[১৫]

এই গ্রন্থাগারের ধ্বংশ যজ্ঞের অন্তিম পর্বটি ভুল ক্রমে মুসলিম শাসনকালের সঙ্গে যুক্ত করা হয়ে থাকে। সেন্সরশিপ নামক নিবন্ধে বলা হয়েছে, এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রমানাদি মজুদ রয়েছে যে, আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারটিকে বেশ কয়েক দফায় পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছিল। ৪৭ খ্রিস্টপূর্বে জুলিয়াস সিজার দ্বারা, ৩৯১ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টানদের দ্বারা এবং ৬৮২ খ্রিস্টাব্দে মুসলিমদের দ্বারা। শেষ দুটি ঘটনার কারন হিসেবে বলা হয়েছে যে, উক্ত গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত প্যাগান সাহিত্য বাইবেলের ওল্ড এবং নিউ টেস্টামেন্ট আর কুরআনের জন্য বিপজ্জনক ছিল।[১৬]

আলেকজান্দ্রিয়ার উক্ত গ্রন্থাগারটির ধ্বংসের সাথে ইসলাম ও মুসলিমের কোন সম্পর্ক নেই। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা থেকে গৃহীত প্রথম দুটি উদ্ধৃতি প্রমাণ করে যে এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে ভ্রমাত্মক। ইসলামের মূল প্রকৃতি হল জ্ঞান অর্জনের উৎসাহ প্রদান। জ্ঞান অর্জনের উৎসাহকে দমন বা নিরুৎসাহিত করা কখনোই ইসলামের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নয়।

ফিলিপ হিট্টি তার লিখিত 'হিস্টরি অফ দ্যা এ্যরাবস' নামক গ্রন্থে লেখেন, একটি কাহিনী প্রচলিত আছে যে, হযরত ওমর (রাযি.) এর আদেশে আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারটি ধ্বংস করা হয়েছিল এবং শহরের অসংখ্য চুল্লী গরম করার জন্য ছয় মাস যাবত জ্বালানি হিসেবে গ্রন্থ গুলি ব্যবহার করা হয়েছিল। এটি মূলত কাল্পনিক রূপকথার ঝুড়ির মত, ইতিহাস নয়। প্রকৃতপক্ষে, টলেমীর তৈরী করা বিখ্যাত গ্রন্থাগারটি ইসলাম আবির্ভাবের বহু পূর্বেই ৪৮ খ্রিস্টপূর্বে জুলিয়াস সিজার দ্বারা ধ্বংস হয়ে যায়। অন্য একটি গ্রন্থাগার যাকে 'Daughter Library' বলা হতো, সেটিও সম্রাট থিওডোসিয়াসের (Theodosius) আদেশে ৩৮৯ খ্রিস্টাব্দে পুড়িয়ে ফেলা হয়। আরবে যখন ইসলামের বিজয় হয় তখন আলেকজান্দ্রিয়াতে উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থাগার অবশিষ্টই ছিলো না এবং প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ কখনোই দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমার (রাযি.) এর খিলাফত কাল সম্পর্কে এরূপ কোন অভিযোগ আনেনি। আবদুল লতিফ আল বাগদাদী, যার মৃত্যু ৬২৯ হিজরীতে (১২৩১ খ্রিস্টাব্দে) হয়, সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে এরূপ কাল্পনিক, মিথ্যায় ভরপুর গল্প তৈরি করে বর্ণনা করে বেড়াতেন। তিনি যে কেন

এরূপ করতেন তা আমার জানা নেই। যাইহোক পরবর্তীকাল থেকে তার এই কথাকেই লিপিবদ্ধ করা শুরু হয় এবং তার পরবর্তী লেখকগণ বিশদভাবে আরও রং মাখিয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করা শুরু করে।[১৭]

ইসলামী সভ্যতা মূলত একেশ্বরবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তা প্রাচীন সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইসলামী সভ্যতা মানুষকে চিন্তার স্বাধীনতা প্রদান করে,যা অতীতের প্রতিটি সভ্যতায় দূলর্ভ ছিল। আর এভাবেই ইসলামী সভ্যতায় জ্ঞানের পরিস্ফুরণ ঘটে। প্রাচীন অন্যান্য সভ্যতাগুলিতে যারা জ্ঞান অর্জন করতো তাদেরকে জুলুম ও নির্যাতন ভোগ করতে হতো। ইসলামী সভ্যতাকে অন্যান্য সভ্যতার সমান্তরাল হিসাবে স্থাপন করার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক অবিচার ছাড়া কিছুই নয়। কথা এখানেই শেষ নয়, আধুনিক বিজ্ঞানের যুগটির সূচনা যাদের হাত ধরে শুরু হয় তারা মূলত ইউরোপীয় নন বরং বস্তুতপক্ষে, তা ছিলো ইসলাম। এটি এমন এক ঐতিহাসিক ঘটনা যা কোন ভাবেই অস্বীকার করা সম্ভব নয়। ইসলামী যুগগুলিতে জ্ঞান অর্জনে সক্রিয়ভাবে উৎসাহ দান করা হয় এবং প্রতিটি বিভাগে বড় বড় পণ্ডিত এবং গবেষকদের জন্ম হয়। এই বিষয়টি ঐতিহাসিকগণ ব্যপক ভাবে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন।

প্রফেসর হোল্ট (P.M. Holt) এবং অন্যান্য প্রাচ্যবিদগণ কতৃক প্রণীত ইসলামী ইতিহাসের উপর এক বৃহৎ গ্রন্থ 'দ্যা ক্যাম্ব্রিজ হিস্টরি অফ ইসলাম' (The Cambridge History of Islam) এর ২- B খন্ডের অন্তর্ভুক্ত 'Literary Impact of Islam in the Modern West" নামের একটি অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, অতীতে ইসলাম আধুনিক পশ্চিমা বিশ্বের শিক্ষা ও সভ্যতার উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। অতঃপর অনুচ্ছেদের শেষ অংশে বলা হয়েছে, মধ্যযুগে সেই জ্ঞানের প্রবাহ প্রায় সমগ্র পূর্ব থেকে নিয়ে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত ছিল। (তখন ইসলামই পশ্চিমাদের শিক্ষক হিসেবে কাজ করছিল)।[১৮]

ফরাসী প্রাচ্যবিদ ব্যারন কারা ডি ভক্স (Baron Carra de Vaux) আরবদের কৃতিত্ব তুলে ধরে বর্ণনা করেন, আরবগণ সত্যই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বড় কৃতিত্ব

অর্জন করেছিল। তিনি আরও বলেন, আমাদের এটি আকাঙ্খা করা উচিত নয় যে, আরবীয়দের মাঝে সেই একই উচ্চতর যোগ্যতা, একই বৈজ্ঞানীক চিন্তাদর্শন, একই উদ্দ্যম এবং সেই একই রকম নব উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তি দেখতে পাবো যেরূপ গ্রিকের দার্শনিদের ছিলো। তাদের বিজ্ঞান গ্রিক বিজ্ঞানের একটি ধারাবাহিক রূপ যা তারা সংরক্ষণ, পরিশীলন এবং কিছু ক্ষেত্রে উন্নতি বিধান ও উৎকর্ষ সাধন করেছিল।[১৯]

মন্টোগোমারি ওয়াট (Montgomery Watt) তাঁর লিখিত 'The Majesty that was Islam' নামক বইটিতে এই বিষয়গুলি উল্লেখ করে বলেছেন, " আরবরা শুধুমাত্র গ্রিকবিদ্যার ভাষ্যকার ছিলেন " এমন মন্তব্য করে তাদের কৃতিত্বকে খর্ব করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তিনি আরও বলেন, আরবীয়রা কেবলমাত্র ভাষান্তরকারী ছিল না। ইউরোপের উন্নয়নের পিছনে আরবদের বিজ্ঞান ও দর্শন ব্যাপক অবদান রেখেছিল।[২০]

আবার এই একই লেখক অন্য একটি স্থানে একটি উক্তি করেছেন যা পূর্বের উক্তি থেকেও গুরুতর। তিনি লিখেছেন, গ্রিক অনুবাদের সুবাদে আরবীয়দের মধ্যে বিজ্ঞান ও দর্শনের উদ্ভব ঘটেছিল।[২১]

গ্রিক বিজ্ঞান আরবীয়দের মাঝে অনুপ্রেরণার সঞ্চার করেছিল - এমন উক্তি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে মোটেই সত্য নয়। এটি বলা ঠিক নয় যে আরবরা গ্রিক অনুবাদগুলি পড়ার ফলে তাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তনের উন্মেষ ঘটে। বস্তুতপক্ষে, কুরআন ও একেশ্বরবাদের ধারণার মাধ্যমে তাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তনের পরিস্ফুরন ঘটে। অতঃপর তারা গ্রিক সহ অন্যান্য ভাষার গ্রন্থগুলি অনুবাদ সম্পন্ন করে অধ্যায়ন শুরু করে। নিজস্ব অধ্যায়নের দ্বারা অর্জিত বিদ্যার উপর গবেষণা ও পর্যালোচনা চালিয়ে, বিজ্ঞান ও দর্শনকে অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির দিকে তারা এগিয়ে নিয়ে যায়।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, এই বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না যে, আরবগগণ বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে গ্রিকদের শিষ্য ছিল। তবে এটিও সত্য যে তারা

গ্রিকবিদ্যা অর্জন করার পর নিজেদের প্রচেষ্টায় এই বিষয়কে আরও অনেকগুন সমৃদ্ধ করেছিল।[২২]

আরবীয়গণ সর্বপ্রথম খুব সম্ভবত গ্রিকদের চিকিৎসা বিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়। কারণ এর বিশেষ ব্যবহারিক গুরুত্ব ছিল। অতঃপর তারা চিকিৎসা বিজ্ঞানে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটায় এবং মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে। এর পূর্বে গ্রিসে একটিও মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ছিল না। ইরাকের মেডিকেল কলেজগুলি শুধুমাত্র শিক্ষাপ্রদান করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং সেখানে শিক্ষা প্রদানের সাথে সাথে উন্নত চিকিৎসা পরিসেবাও প্রদান করা হতো। পৃথিবীর সর্বপ্রথম মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালটি খলিফা হারুন আর রাশিদের উদ্যোগে বাগদাদে ৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারপর দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগে সেখানে আরও চারটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ইতিহাস রয়েছে। মিশরের কায়রোতে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে একটি হাসপাতালে একই সাথে ৮০০০ (আট হাজার) ব্যক্তির চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। তাতে পুরুষ ও নারী রোগীদের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকার রোগের জন্য পৃথক পৃথক ওয়ার্ড ছিল। উক্ত হাসপাতালগুলিতে, সেখানে পুরুষ-মহিলা উভয় ধরণের চিকিৎসক, শল্যবীদ (Surgeons), ফার্মাসিস্ট, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, পরিচালকবৃন্দ ছিলেন এবং এরই সঙ্গে স্টোর রুম বা মজুদগার, একটি করে প্রার্থনা গৃহ, বক্তৃতা প্রদানের জন্য হলরুম সহ একটি করে সমৃদ্ধ পাঠাগার ছিল।[২৩]

এভাবেই আরবীয়গণ তাঁদের গবেষণার মাধ্যমে চিকিৎসা ক্ষেত্রে অসাধারণ অগ্রগতি অর্জন করেছিল। চিকিৎসাক্ষেত্রে সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসক হিসেবে যার নামটি অমর হয়ে রয়েছে, তিনি হলেন, আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া আর রাযি (মৃত্যু-৯২৩)। ইউরোপীয়ানদের কাছে তিনি রাজেস (Rhazes) নামে পরিচিত। বিজ্ঞান ও দর্শনের (Scientific and Philosophy) বিষয়ে তিনি বহু গ্রন্থরচনা করে গিয়েছেন। এখনও তাঁর লিখিত পঞ্চাশটিরও অধিক রচনা প্রচলিত রয়েছে। তাঁর সর্ববৃহৎ রচনাটি হলো, আল-হাভি (Al-Havi) যা Continens' নামে ল্যাটিন ভাষায় অনুদিত হয়। এটিই সর্বপ্রথম চিকিৎসা বিষয়ক

এনসাইক্লোপিডিয়া ছিল, এই গ্রন্থে প্রতিটি রোগ তার লক্ষ্মণ সহ প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা এবং তার প্রতিষেধক কোন কোন ওষুধে রয়েছে সে সম্পর্কেও বর্ণনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থটি তার মৃত্যুর পরবর্তীতে তারই শিষ্য সম্পূর্ণ করেন। উক্ত গ্রন্থে আর রাযি, প্রতিটি রোগ বিষয়ে গ্রিক, সিরিয়, ইরানী, ভারতীয় এবং আরবীয় চিকিৎসকদের চিকিৎসা পদ্ধতিও লিপিবদ্ধ করে ছিলেন এবং তারপর তিনি তার চিকিৎসা সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ সংযোজন করেন এবং তার চুড়ান্ত অভিমত জ্ঞাপন করেন।

মেডিসিন বিষয়ে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন, তিনি হলেন, ইবনে সিনা। যিনি পাশ্চাত্য সভ্যতায় অ্যাভিসেন্না (Avicenna) নামে পরিচিত। চিকিৎসা ক্ষেত্রে তাঁর এতো সুখ্যাতির মূল কারণ হল তিনি তার তীক্ষ্ণ চিকিৎসা সংক্রান্ত পর্যবেক্ষনের সঙ্গে গভীর আত্মিক জ্ঞান ও সুশৃঙ্খল চিন্তাভাবনার সমন্বয় সাধন করতে পেরেছিলেন। তার লেখা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল কানূন ফিত ত্বীব (Al-Qanun fi't-Tib) দ্বাদশ শতাব্দীতে ল্যাটিন ভাষার অনুদিত হয়ে ইউরোপে প্রবেশ করে। সেই অনুদিত কপিটির নাম রাখা হয় "কোয়ানন অফ মেডিসিন" (Qanon of Medicine)।

ইউরোপে এই গ্রন্থটি গ্যালেন এবং হিপোক্রেটিসের লিখিত বইগুলি থেকেও অনেক বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইবনে সিনার লেখা এই গ্রন্থটি সমগ্র ইউরোপের চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষনার জন্য একমাত্র উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হিসেবে ষষ্ঠদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। শুধুমাত্র পঞ্চদশ খ্রিস্টাব্দেই ইউরোপে এই গ্রন্থটির ষোলোটি ছাপা সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ষোড়শ শতকে বিশটি সংস্করণ এবং সতেরো শতকে আরও বেশ কয়েকবার মুদ্রণ হয়। ইবনে সিনা বা অ্যাভিসেন্নার মোটামুটি সমসাময়িক ছিলেন, শল্য চিকিৎসক এবং অস্ত্রপচার যন্ত্রের প্রধান (Surge and Surgical Instruments), আরবী লেখক, আবুল কাশিম আয-যোহরাবী (Abul Qasim Az-Zohrawi)। তাঁর মৃত্যু ১০০৯ এর পর। যিনি সাধারনত ল্যাটিন ভাষায় এ্যবুল ক্যাসিস (Abulcasis) নামে পরিচিত।

আরবীয়রা চিকিৎসা বিজ্ঞান একাদশ শতাব্দীর সূচনাতেই উন্নতির চুড়ান্ত শিখরে পৌঁছে যায় এবং আরো কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত তারা উন্নয়নের শিখরে অধিষ্ঠিত থাকে। চৌদ্দশতকে স্পেনের গ্রানাডা এবং আলমেরিয়াতে যে প্লেগ বা মহামারী দেখা দিয়েছিল, সেই মহামারী সম্পর্কে আরবীয় চিকিৎসকগণ গভীর ভাবে পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন সেই অভিজ্ঞতাগুলি বিস্তারিত তথ্য সমৃদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করেছিলেন, যা আজও হারিয়ে যায়নি (অর্থাৎ এখনও সেই লেখাগুলি অবশিষ্ট রয়েছে)।[২৪]

স্পেনের আবদুল্লাহ ইবনে বায়তার (Abdullah ibn Baytar)(মৃত্যু, ১২৪৮) মুসলিম বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত উদ্ভিদবিদ (Botanist) এবং ফার্মাসিস্ট ছিলেন। ফিলিপ হিট্টি তার বিষয়টি উল্লেখ্য করতে গিয়ে লেখেন, তিনি উদ্ভিদ বা ভেষজ উদ্ভিদের বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করার জন্য স্পেন সহ আফ্রিকার বড় একটি অংশ ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি অগণিত ভেষজ উদ্ভিদের চিকিৎসা বিষয়ক গুরুত্বের উপর ব্যাপক গবেষণা চালান। তিনি মিশরের কায়রোতে আয়ুবিদ আল মালিক আল কামিল (Ayyubid al Malik al Kamil) নামক প্রধান ভেষজবীদ হিসেবে চাকরিতে প্রবেশ করেছিলেন। মিশর থেকে তিনি সিরিয়া ও এশিয়া মাইনর অঞ্চলে বিস্তর ভ্রমণ করেন। তিনি তার গবেষনা এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে দুটি বৃহৎ বিস্তারিত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তার রচিত গ্রন্থ দুটির নাম হলো, আল মুগনী ফি আল আদ্বিয়াহ আল মুফরাদাহ (Al Mughni fi al Adwiyah al Mufradah) - একটি মেটিরিয়া মেডিকা; এবং অন্যটির নাম আল জামী ফি আল আদ্বিয়াহ আল মুফরাদাহ (Al Jami fi al Adwiya al Mufradah) - লেখকের নিজস্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা সমৃদ্ধ গ্রিক ও আরবীয় উপাত্ত অবলম্বনে পশু, ভেষজ ও খনিজ থেকে প্রাপ্ত সহজ নিরাময় চিকিৎসা সংক্রান্ত একটি সঙ্কলন। এটি মধ্যযুগীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। এখানে উল্লেখিত ১৪০০ বিষয়ের মধ্যে ২০০ টি উদ্ভিদ সহ ৩০০ টি তার অভিনব সংযোজন, এবং উদ্ধৃত ১৫০ জন লেখকের মধ্যে ২০ জন ছিলেন গ্রিক। এবনে আল-বাতিয়ারের লেখার আংশিক ল্যাটিন সংস্করণ সিমপ্লিসিয়া ১৭৫৮ সালে ক্রিমোনাতে প্রকাশিত হয়।[২৫]

চিকিৎসা, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং গণিতের পর আরব মুসলিমদের মধ্যে সব থেকে বড় অবদান যে বিষয়টির উপর রয়েছে, তা হলো, রসায়ন (Chemistry)। মুসলিম বিজ্ঞানীগণ রসায়নবিদ্যাকে অ্যালকেমি বা অপরসায়ন থেকে বের করে আনেন এবং তাকে গবেষণালব্ধ জ্ঞান দ্বারা বিজ্ঞানের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন। রসায়ন ও অন্যান্য প্রকৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরবীয়গণ বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষা - নিরীক্ষার প্রচলন করেছিলেন, যা গ্রিকদের অস্পষ্ট অনুমান ভিত্তিক কর্মকাণ্ড থেকে বহুগুনে সমৃদ্ধ ছিল।

আল রাযির (Al-Razi) পরে, জাবীর ইবনে হাইয়ান (৭২১-৮১৫) মধ্য যুগের রসায়ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্যান্যদের তুলনায় সর্বাধিক মর্যাদার স্থান অর্জন করেছিলেন। প্রাচীন অপরসায়নবিদদের তুলনায় তিনি পরীক্ষা - নিরীক্ষাকে আরও স্পষ্টভাবে স্বীকৃতি ও গুরুত্ব প্রদান করেন এবং রসায়নের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি বিধান করেন।[২৬]

জাবীর ইবনে হাইয়ানের গ্রন্থগুলি পঞ্চদশ শতক অবধি ইউরোপে রসায়ন বিদ্যার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মর্যাদার স্থানে অধিষ্ঠিত ছিল। অষ্টাদশ শতকের আধুনিক পশ্চিমা রসায়নের উন্নতির সোপান, এই জাবীর ইবনে হাইয়ানই তৈরি করেছিলেন। ধারণা করা হয় যে, জাবীর ইবনে হাইয়ান বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উপরে প্রায় দুই হাজার গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। মুসলিমদের পূর্বে এমন কোন গ্রন্থাকার ছিলেন না যিনি এতো অধিক পরিমান গ্রন্থ রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এগুলি শুধু মাত্র অতি সামান্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু বর্ণনা। আরও এমন অসংখ্য উদাহরণের সাহায্যে বলা যায় যে, ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞানের শত্রু নয়; বরং ইসলামই একমাত্র ধর্ম যে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ধারক ও প্রসারক। প্রাচীন যুগগুলিতে জ্ঞান, বিজ্ঞানের সাথে শত্রুতা ঐ সকল ধর্ম গুলিই পোষন করতো

যারা বহুশ্বরবাদ এবং কুসংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইসলামই বহুশ্বরবাদ এবং কুসংস্কারের অবসান ঘটায় এবং ধর্মকে একনিষ্ঠ একত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করে। অতএব এই অবস্থায় এমন কোন প্রশ্নই আসে না বা আসা যুক্তিযুক্ত নয় যে, ইসলাম জ্ঞান বিজ্ঞান এবং গবেষণার শত্রু।

জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি বহুশ্বরবাদ এবং কুসংস্কারের ক্ষেত্রে অভিশাপ স্বরূপ। এজন্য বহুশ্বরবাদী এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্ম ও তার অনুসারীগণ সর্বদা জ্ঞানের উন্নতি ও অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাড়িয়েছে। অন্য দিকে একেশ্বরবাদীদের বিষয়টি সব থেকে ভিন্ন। জ্ঞানের উন্নতিতে একেশ্বরবাদ সত্যতাকে অধিক যাচাই করে, তাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে। এই একেশ্বরবাদী ধর্ম সর্বদা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উৎসাহ দান করেছে।

ইসলাম হৃদয়ের মুক্তিদাতা

প্রাচীন বহুশ্বরবাদী যুগে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে যে পরিবেশ ও পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিলো, তা শুধুমাত্র কুসংস্কারের প্রসারকেই উৎসাহিত করেছিল। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানময় মানসিকতার উন্নয়নের জন্য সঠিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি তৈরিতে সক্ষম ছিল না। এই কারনেই প্রাচীন যুগে কোন দেশেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয় নি। এই উন্নয়নের ধারা শুধুমাত্র তখন থেকেই শুরু হয়, যখন ইসলামী বিপ্লব এসে মেধাকে বহুশ্বরবাদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয় এবং তার ফলে দৃষ্টিভঙ্গীর কার্যকরী রূপান্তর ঘটতে থাকে।

প্রাচীন গ্রিস

প্রাচীন গ্রিসের প্রতিটি বিষয়ের সাথে কোন না কোন দেব-দেবী জড়িত ছিল। মানব মনে সব থেকে বেশি প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল গ্রিক মিথলজি (Greek Mythology) যা ছিল উচুদরের অমর ও অভিমানবিক বীরদের নিয়ে রচিত পৌরাণিক উপকথার সংকলন মাত্র। এনসাইক্লোপিডিয়া অফ গ্রিক মিথলজি নামে এই বিষয় বস্তুর উপরে রচিত বৃহৎ একটি বিশ্বকোষ রয়েছে। এদের উৎপত্তি ও ক্রিয়াকলাপ দৈব আবেশপূর্ণ নিগুঢ় আচ্ছাদন আবৃত থাকলেও, প্রাচীন গ্রিকগণ এই পৌরাণিক চরিত্রগুলকে ঐতিহাসিক চরিত্র হিসাবে গণ্য করতো।

বেশিরভাগ গ্রিক কবিতা ও নাটকের প্রধান উপজীব্য ছিল গ্রিক পুরাণ। এমনকি দার্শনিক ও ঐতিহাসিকদের উপর তা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। মধ্য যুগের কবিগন, এবং শেক্সপিয়ার থেকে শুরু করে রবার্ট ব্রিজ পর্যন্ত প্রায় সকল ইংরেজ কবি সাহিত্যিকগণ গ্রিক পুরাণ থেকে প্রেরণা অর্জন করেছিলেন। সাহিত্য ও কলার ক্ষেত্রে উদ্দীপনা সঞ্চার করলেও, আধুনিক অর্থে যাকে বিজ্ঞানমনস্কতা বলা হয় তার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে (গ্রিক পুরাণ) পরিপূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়।

প্রাচীনকালে গ্রিকরা এক সুপ্রসিদ্ধ সভ্যতার উত্তরাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা প্রসারের ক্ষেত্রে তারা কিছুই করতে পারেনি। ইউরোপে বৈজ্ঞানিক চেতনার প্রসার বহু পরে হয়েছিল এবং তা হয়েছিল মূলত ইসলামী অনুপ্রেরণার ফলশ্রুতিতে। কারণ ইতিপূর্বে বৈজ্ঞানিক চেতনা প্রসারের পথে বহুশ্বরবাদী ধ্যান ধারণা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। বিপরীতক্রমে একেশ্বরবাদী চেতনা মুক্তচিন্তার প্রসার ঘটিয়ে এক নবযুগের সূচনা করেছিল।

রোমান সভ্যতা

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার মতে, খ্রিস্টের জন্মের পূর্বেই রোমানগণ, ভূমধ্যসাগরীয় বিস্তৃত অঞ্চলের উপর বিজয় ও আধিপত্য অর্জন করেছিল। কিন্তু বিজ্ঞানীদের জন্য রোম প্রতিকুল হয়ে উঠেছিলো। এই সভ্যতা রাজনীতি ও ব্যক্তিত্বের বিচারে এত পরিশীলিত ছিল, বিদগ্ধ সুশৃঙ্খলিত আইন দ্বারা এত সুরক্ষিত ছিল, যুদ্ধবিদ্যা ও জনস্বাস্থ্যবিষয়ে এত উন্নত ছিল, তবুও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একজন বিজ্ঞানীকেও জন্মদান করতে সক্ষম হয় নি।[২৭]

নিবন্ধটিতে আরও বলা হয়েছে, ঐতিহাসিকগণ, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রোমানদের এই করুন ব্যর্থতার কারন চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছে। তারা বলেছে যে,সম্ভবত রোমানদের সামাজিক কাঠামোতে, দীর্ঘ একটি সময় ধরে যে যাদুবিদ্যার প্রাদুর্ভাব ছিল,তাই মূলত প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কে সুশৃঙ্খল জ্ঞানের গবেষণার পথে চলাকে তাদের (রোমানদের) জন্য সুকঠিন করে দিয়েছিল। যখন কেউ সেই সমস্ত নগণ্য সংখ্যক সভ্যতার কথা ভাবে যেখানে কিছুটা বিজ্ঞানের উদয় হয়েছিল তখন বিপরীতক্রমে রোমকে স্বাভাবিক হিসাবে এবং ক্লাসিক্যাল গ্রিককে এক বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হিসাবে গণ্য করে।[২৮]

সাধারণত ঐতিহাসিকগণ এই প্রশ্নটির কোন সমাধানযোগ্য উত্তর দিতে সক্ষম হয় নি। তবে বর্তমান অভিজ্ঞতা থেকে এ প্রশ্নটির সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব। যখন আমরা জ্ঞাত হয়েছি যে, রোমান জাতি পৌত্তলিকতায় লিপ্ত ছিল, তখন সহজ ও বাস্তব উত্তরটি হল, এরূপ কুসংস্কার, মূর্তিপুজা,বহুশ্বরবাদই মুলত রোমানদেরকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিচরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রাকৃতিক বস্তুকে ঐশ্বরিকতার আসনে বসানোর ফলে তাদের বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছিল।

বিজ্ঞানের ঊষা

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার (১৯৮৪) অভ্যন্তরে হিস্ট্রি আফ সাইন্স (History of Science) নামক নিবন্ধে বলা হয়েছে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে বর্তমান সময়ে যে দৃষ্টিতে দেখা হয়, তা মানব ইতিহাসের মধ্যে একটি অতি নতুন এক বিষয়। আধুনিক অর্থে বিজ্ঞানের ধারনার উদ্ভব না হলেও, অতীতে বড়ো বড়ো সভ্যতাগুলি উন্নত ধরণের প্রযুক্তি, ধর্মীয় ও আইন ব্যবস্থা তৈরী করেছিল। মিশর, মেসপটেমিয়া, ভারত ও অন্যান্য দেশগুলিতেও প্রাচীণ যুগে এই একই অবস্থা ছিল। এমনকি হিব্রু জাতি যাদের ধর্ম ইউরোপীয় সভ্যতার মূল ভিত্তির মধ্যে বড় একটি অংশ দখল করেছিল, সেই জাতিও বিজ্ঞানের প্রতি চরম উদাসীন ছিল। যদিও প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে গ্রিক জাতি এমন এক চিন্তার উদ্ভাবন ঘটিয়েছিল, যা ছিল বিজ্ঞানের অনুরূপ। তবে পরবর্তী শতাব্দীতে সেই বিষয়টির আর কোন উন্নয়ন ও অগ্রগতি সম্ভব হয় নি। বিজ্ঞানের এই মহাশক্তি, মানব জীবনের প্রতিটি স্তরে বিজ্ঞানের বিস্তৃত প্রভাব, অতি সাম্প্রতিক কালে সংঘটিত একটি বিষয় বা ঘটনা।

ইউরোপে বিজ্ঞানের সূচনা ঐতিহাসিকভাবে সর্ব প্রথম পরিলক্ষিত হয় ষষ্ঠ ও পঞ্চম খ্রিস্ট পূর্বাব্দে ভুমধ্যসাগরের পূর্বদিকের দ্বীপ ও তট সমূহে অবস্থিত নগর রাষ্ট্রসমূহের দার্শনিকদের মধ্যে। তাদের লিখিত রচনাগুলিও সব সংক্ষিপ্ত আকারে আমাদের নিকট পৌঁছেছে, তাও আবার সেই সকল লেখকদের উদ্ধৃতির মাধ্যমে যারা মূল লেখকের থেকে শত শত বছর পর জন্ম গ্রহন করেছেন।[২৯]

এই সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতিগুলি অতিমাত্রায় ভুল-ভ্রান্তিপূর্ণ। উদাহরণসরূপ, দার্শনিক থ্যালিস (Thales) এর একটি উক্তিতে বর্ণিত হয়েছে যে,"সব কিছুই জল।" স্পষ্টত এটি একটি জ্ঞানগর্ভ উক্তি। তবে এই উক্তিটির পূর্ণরূপ সম্মুখে রাখলে তা একটি কুসংস্কারপূর্ণ মতাদর্শ হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। পূর্ণ বাক্যটি হলো, 'সব কিছুই জল, আর জগত দেবতায় পূর্ণ।'[৩০] থ্যালেস প্রাচীন গ্রিসের দার্শনিক ছিলেন, বলা হয়ে থাকে তার যুগটি ছিল খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর। তার জীবনী ও

লেখা সম্পর্কে খুব বেশি জানা যায় না। তারপরেও তিনি প্রাচীণ গ্রিকের জ্ঞানীদের মধ্যে সপ্তম কিংবদন্তিদের মধ্যে অন্যতম একজন।

গ্রিক ও রোমান জাতির বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী হল - বহুশ্বরবাদী মতাদর্শ। এই মতাদর্শ তাদের মন মানসিকতাকে আচ্ছন্ন করে রেখে ছিল। তারফলে তারা বাস্তবতাকে অনুধাবন করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছিল। এহেন পরিবেশে তারা যদি বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য কাজ করতেও চাইতো তাহলে তা কিভাবে সম্ভব হত?

অগ্রগতির দিকে যাত্রা

গ্রিক ইউরোপের একটি দেশ। অতীতে এই ভুখন্ডটিতে বেশ কিছু উচ্চমানের বিজ্ঞানীর জন্ম হয়। সেই ধারাবাহিকতারই একজন হলেন, আর্কিমিডিস (Archimedes) যিনি হাইড্রোষ্টাটিক্স এ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন এবং একটি সরল যন্ত্র তৈরি করেছিলেন যার নাম ওয়াটার স্ক্রু (Water Serew)। খুব অদ্ভুত বিষয় হলো এই ধরণের বিজ্ঞান মনস্ক মানুষগণ আকাশে উল্কার ন্যায় জ্বলে উঠে খুব দ্রুতই হারিয়ে যান। তারা গ্রিক সহ সমগ্র ইউরোপকে শিল্প ও বিজ্ঞানের যুগে প্রবেশ করাতে সক্ষম হন নি। প্রাচীন গ্রিক শিক্ষাদীক্ষা আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক ইউরোপের মধ্যে একটা দীর্ঘ বৃদ্ধিবৃত্তিক ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। আর্কিমিডিস ওয়াটার স্ক্রু ২৬০ খ্রিস্টপূর্বে আবিষ্কার করেন। অতঃপর জার্মানের গুটেনবার্গ (J. Gutenberg) ১৪৫০ সালে মেশিন প্রেস (ছাপার যন্ত্র) আবিষ্কার করেন। দুই জনের মধ্যে অন্তত এক হাজার পাঁচশত বছরেরও অধিক সময়ের ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়।

এমনটি কেন হলো? কি এমন কারন রয়েছে, যে প্রাচীন গ্রিক বিজ্ঞান, গ্রিক সহ সমগ্র ইউরোপের কোথাও বিস্তার লাভ করতে পারলো না? এই প্রশ্নটির জবাব একটিই, আর তা হলো, ইসলামী বিপ্লবের পূর্বে পরিবেশ সম্পূর্ণ প্রতিকুল হওয়ার কারণে বিজ্ঞানের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজটি স্বাধীন ভাবে চালিয়ে যাওয়া

সম্ভব ছিল না। ইসলামের আগমনের পর একেশ্বরবাদী বুনিয়াদের উপর যে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লো, তারপরেই কেবলমাত্র বিজ্ঞানের উন্নতির পথে সকল বাধা দূরীকরণ করা সম্ভব হল। সমগ্র মানব ইতিহাসে এই ধরণের বুদ্ধির মুক্তি প্রথমবারের মতো উপলব্ধ হল।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমৃদ্ধি একটি ধারাবাহিক অগ্রগতির নাম। গ্রিক পন্ডিতদের কৃতিত্বগুলি অবশ্যই কালের প্রতিকুল পরিস্থিতির কারনে এই পথে অগ্রসর হতে পারেনি। সাময়িক উজ্জ্বলতা প্রদর্শন করে সেগুলি কালের অন্ধকারে হারিয়ে যায়। অতঃপর খ্রীষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে যখন ইসলামী বিপ্লব কুসংস্কারের যুগকে ধ্বংস করে দেয়, তখন থেকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী হয়। সেই মূহুর্ত থেকে বিজ্ঞানের গবেষণা মূলক কার্যগুলি ধারাবাহিক ভাবে পথ চলতে শুরু করে এবং বর্তমান উন্নয়নের সর্বোচ্চ অবস্থানে এসে পৌঁছায়।

পূর্ববর্তী সমাজ ও পরিবেশের প্রতিকূলতার কারনে প্রাচীন গ্রিক পন্ডিতদের দৃষ্টিভঙ্গি, শুধুমাত্র তত্ত্বের মাঝেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। তা নিয়ে গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে তারা সক্ষম হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ, অ্যারিস্টটল পদার্থ বিজ্ঞানের উপর গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু তিনি তাঁর সমগ্র জীবনে একটি বারও সে বিষয়গুলি নিয়ে ব্যবহারিক ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন নি। যদিও গ্রিক পন্ডিতগণ যুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রেখেছিল। কিন্তু তাদেরকে প্রয়োগিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একদমই খুঁজে পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানের প্রকৃত সূচনা সেই সময়ই হয় যখন মানুষের ভেতরে মুক্ত অনুসন্ধানের চেতনা তৈরি হয়। প্রাচীনকালে এই ধরনের চেতনা বিক্ষিপ্তভাবে বিশেষ ব্যক্তি মানসে পরিস্ফুট হলেও, বাহ্যিক পরিবেশগত প্রতিকূলতার কারণে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয় নি।

ইসলামের একেশ্বরবাদী বিপ্লবের পর সত্যিকারের মুক্তচিন্তার উপযোগী পরিবেশ রচিত হয়। সামগ্রিক পরিবেশের মধ্যে হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া এই পরিবর্তন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পথকে সুগম করেছিল। এই বিজ্ঞানমনষ্কতা বা চেতনা সর্বপ্রথম পবিত্র মক্কা ভূমিতে পরিলক্ষিত হয়। অতঃপর তা মদিনা ও

দামেস্কে সম্প্রসারিত হয়। তারপর তা আরও অগ্রসর হয়ে বাগদাদে উদ্ভাবনী চিন্তনের কেন্দ্র স্থাপন করে। সেই কেন্দ্র থেকে স্পেন ও সিসিলির পথ ধরে ইটালি হয়ে এই চেতনা সমগ্র ইউরোপে পৌঁছে যায়। সেখানে পৌঁছে স্থির না থেকে তা ক্রমেই বিস্তৃত হতে থাকে অপ্রতিরোধ্য গতিতে। এমনকি তা শেষ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের প্রাচীন অজ্ঞতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তা চেতনাকে পরিবর্তন করে দেয়।

জ্ঞানের এই উন্নয়নের গতি ইসলামী বিপ্লবের পূর্বে সূচিত হতে পারে নি। ইসলামী বিপ্লবের পূর্বে বিজ্ঞান মনস্ক চেতনা শুধু বিক্ষিপ্ত ভাবে ক্ষণকালীন সময়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমায় হঠাৎ জন্ম নিত এবং প্রাচীন পরিবেশ ও রাষ্ট্রে ছড়িয়ে থাকা কুসংস্কার ও বহুশ্বরবাদী চেতনার রোষানলে পড়ে অতি দ্রুততার সাথে তার পরিসমাপ্তি ঘটতো। ইসলামই সর্বপ্রথম বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ উপহার দেয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অনৈশ্বরিক বস্তুকে ঐশ্বরিক জ্ঞান করা

বিশিষ্ট নৃতাত্ত্বিক নাথান সোডারব্লম (Nothan Soderblom) ১৯১৩ সালে একটি জরিপ চালিয়ে বলেছিলেন, ধর্মের কেন্দ্রীয় ভিত্তি হল ঐশ্বরিকতার বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা। তখন থেকে ব্যাপক হারে ধর্ম নিয়ে অধ্যায়ন ও গবেষণা করা হয় এবং জার্মান,ফরাসি, ইংরেজি ইত্যাদি ভাষাভাষী পন্ডিতগণ এই বিষয়টি নিয়ে অধিক পরিমান গ্রন্থ রচনা করেন। খুব অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বর্তমানের অধিকাংশ ধর্মীয় পন্ডিতগণ একমত যে, ধর্মের মূল ভিত্তিই হলো 'Holiness' বা ঐশ্বরিক পবিত্রতা, অর্থাৎ নিদিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু রহস্যময় গুণাবলির আধার অথবা অসম্ভব শক্তির অধিকারী হিসেবে জ্ঞান করা বা গ্রহন করা যা সাধারণ কোন মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় না। রহস্যময় বৈশিষ্ট্যগুলি সাধারণ যুক্তিবাদী নীতি বা ধারণা দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।[৩১]

ঐশ্বরিক পবিত্রতার এই ধারণাটি কোন কাল্পনিক বিষয় নয়। তা মানুষের প্রকৃতির মধ্যে সর্বোচ্চ গভীরতায় গ্রথিত রয়েছে। এটির সঠিক ব্যবহার পদ্ধতি হল, মানুষ তার সেই অনুভূতিকে শুধুমাত্র একজন ঈশ্বরের জন্যই নির্ধারণ করবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমনতর হয় যে, মানুষের অনুভূতি ঈশ্বর নয় এমন কোন বস্তুর দিকে অপসৃত হয়। ফলে যে অনুভূতিটি বাস্তব ঈশ্বরের ঐশ্বরিকতার অভিমুখে থাকার কথা ছিল তা দিকভ্রষ্ট হয়ে সৃষ্ট বস্তুর দিকে নিবদ্ধ হয়ে যায়।

এর মূল কারন হল, ঈশ্বর একটি অদৃশ্য বাস্তবতা। মানুষ তার চর্ম চক্ষু দ্বারা সেই মহান পবিত্র সত্তার দর্শনে অক্ষম। আর এজন্যই তারা জগতে দৃশ্যত সকল বস্তুকেই পবিত্রসত্তা হিসেবে জ্ঞান করতে থাকে। সে সকল বস্তুর পূজা-অর্চনায় লিপ্ত হয়। এই প্রবৃত্তিই প্রাচীন যুগে এমন সব বিষয় বস্তুর জন্ম দিয়েছিল, যাকে ধর্মের পরিভাষায় বহুশ্বরবাদীতা এবং তত্বগত ভাবে প্রকৃতি পুজা (Nature Worship) বলা হয়। মানব মনে পবিত্র বা ঐশ্বরিক সত্তার প্রতি আনুগত্যের

অনুভুতিটি হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে উৎসারিত হয়। ফলস্বরূপ, যে সমস্ত প্রাকৃতিক উপাদান যথা তারকারাজি, বৃষ্টিপাত, পশুপাখি, বৃক্ষরাজি, জল ও অগ্নি, তাদের উপর দৃশ্যগত রেখাপাত করে তাদেরকে তারা উপাসনা করতে শুরু করে। পয়গম্বরদের শেখানো মহিমান্বিত ঈশ্বরের ধারণা পূর্ব থেকেই বর্তমান ছিল। কালক্রমে এই ধারণা বিকৃত হয়ে এমন এক স্বর্গীয় ঈশ্বরের ধারণা উদ্ভূত হয় যেখানে বলা হয় ঈশ্বর এই পৃথিবীর অনুপুঙ্খ পরিচালনার ভার থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করে আকাশে সর্বোচ্চ চূড়ায় অদৃশ্য হয়ে অলসভাবে অবস্থান করছেন। আর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব প্রাকৃতিক শক্তির উপর বা প্রাকৃতিক শক্তির মত প্রতীকগুলির উপর বন্টন করে দিয়েছেন।[৩২]

বর্তমান যুগের ধর্মীয় বিশেষজ্ঞগণের প্রায় সকলেই একমত যে, ধর্মের মূলনীতি পবিত্রসত্তার উপর বিশ্বাস স্থাপনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ বস্তুগুলির মধ্যে এমন কিছু নির্বাচিত গুনাবলি অথবা প্রভাবিতকরণ ক্ষমতার অধিকারী মনে করা যা অন্যান্য বস্তুর ভেতর পাওয়া যায় না এবং সেগুলিকেই ঐশ্বরিকতার আধার বলে গণ্য করা। সাধারণ যুক্তিবাদী মৌলনীতির উপর ভিত্তি করে এগুলি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

সাধারণভাবে ব্যক্তি মানসে ঐ সকল ঈশ্বরগুলির বিষয়ে ভীতি ও আশা পোষণের মানসিকতার জন্ম হয়। কেবলমাত্র ঐ ঐশ্বরিক শক্তিগুলি মানুষের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে এবং তাদের প্রতি তারা যে অনুকম্পা প্রকাশ করে তা মূলত আস্থা ও আতঙ্কের সমন্বয়ে সৃষ্ট হয়। সে মনে করতে থাকে সে যেখানে যেভাবেই অবস্থান করুক না কেন, যত ক্ষমতাবানই হোক না কেন, সেই জিনিসের সামনে তার সকল সীমার পরিসমাপ্তি ঘটে।

তাদের উদ্ভাবিত সেই সকল তথাকথিত ঐশ্বরিকতার ধারক ও বাহকগুলি বিভিন্ন প্রকার। যেমন, পাথর, পশু-পাখি, সাগর, নদী, সূর্য, চন্দ্র সেই সাথে রাজা,বাদশাহ এবং ধর্মীয় পুরোহিতশ্রেণী ইত্যাদি। মানুষ এই সকল ব্যক্তি ও বস্তুগুলিকে ঐশ্বরিকতার ধারক-বাহক হিসেবে মেনে নিয়ে উপাসনা করা শুরু

করে। এই সকল বস্তুর নামে প্রাণী উৎসর্গ করতে থাকে। তাঁদেরকে খুশি করার লক্ষ্যে অথবা সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবং তাঁদের রুষ্টতা ও শাস্তি থেকে বেঁচে থাকার জন্য, তাঁদের আশির্বাদ প্রাপ্তির লক্ষ্যে একাধিক ধর্মীয় আচার ও রীতি পালন করতে থাকে।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার (১৯৮৪) ভাষায়, ঐশ্বরিকতা প্রকাশিত হয় এমন মানবগুলি হল, সংসার ত্যাগী, তপসী, ধর্মীয় পুরোহিত, রাজা-বাদশাহ; নির্ধারিত কোন স্থান যেমন, মন্দির, মূর্তি; প্রাকৃতিক দৃশ্যমান কোন বস্তু যেমন, নদ-নদী, সূর্য-চন্দ্র, পাহাড়, বৃক্ষ ইত্যাদি। ধর্মীয় পুরোহিত শ্রেণীগণ হলেন ঈশ্বরের বিশেষ প্রতিনিধি, যারা ঐশ্বরিক ক্রিয়া ও আচার অনুষ্ঠান উপস্থাপন ও সম্পাদনের মাধ্যমে ঐশ্বরিক সত্তার প্রতিনিধিত্ব করেন। অনুরূপভাবে, রাজা-বাদশাহগণ হলেন স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে বিশেষ মধ্যস্থকারী। এই মতাদর্শের ভিত্তিতে তাদেরকে স্বর্গীয় সন্তান ও ঈশ্বরের হাতিয়ারও বলা হয়ে থাকে।[৩৩]

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার মতে, যে সকল বিশেষজ্ঞগণ পবিত্রতা বা ঐশ্বরিকতাকে (Holding Sacredness) ধর্মের মূল ভিত্তি হিসেবে মত দিয়েছেন তাদের মধ্যে কিছু বিশেষজ্ঞের নামঃ নাথান সোডারব্লাম,রুডল্ফ ওট্ট, এমিলি দূর্খাইম, ম্যাক্স শেলার, জেরাডাস ভেন্ডার লিউ, ডাব্লু ব্রেড ক্রিসটেমসেন, ফ্রেডরিচ হিলার, গুস্তভ মেনসিং, রজার এবং ইলিয়াড।[৩৪]

আধুনিক ধর্ম বিশেষজ্ঞদের এই উক্তিটি সঠিক, যে ধর্মের ভিত্তি হলো পবিত্রতা বা ঐশ্বরিকতায় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐশ্বরিকতার এই অনুভূতি একটি স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক অনুভূতি। তবে যখন এক ঈশ্বর ব্যতীত অন্যকে পবিত্র হিসেবে গ্রহন করা হয় তখন সঠিক বা মূল প্রকৃতি ও স্বাভাবিক অনুভূতির ভুল ব্যবহার করা হয়, আর এটাই সকল মন্দের উৎস। মানুষ যখন সৃষ্টবস্তুকে স্রষ্টা হিসেবে গ্রহন করে তখন সে যেন সর্বপ্রকার উন্নয়নের দ্বার নিজ হাতে বন্ধ করে দেয়।

সৃষ্টবস্তুকে স্রষ্টা হিসেবে মান্য করা হয় দুই ভাবে। প্রথমতঃ প্রকৃতিকে ঈশ্বর হিসেবে মান্য করা হয় এবং দ্বিতীয়তঃ মানুষের মধ্যে থেকে কাউকে ঈশ্বর মনে করা হয়। এই দুটি মন্দ জিনিস প্রাচীন যুগে কোন না কোন রূপে সমগ্র বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত ছিল। মানুষের চিন্তাচেতনাকে অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকার এটাই সবচেয়ে বড়ো কারন।

ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যের বিষয়টি মানুষের হৃদয়ের গভীর অংশের সাথে সম্পৃক্ত। আর এমনতর মনস্তাত্ত্বিক বিষয়কে স্বল্প কিছু বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা সুকঠিন একটি কাজ, কারন গভীর মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার বা চিন্তাধারা প্রকাশের লক্ষ্যে ব্যবহৃত শব্দগুলি প্রায়শই বাস্তব থেকে প্রতিকী হয় বেশি। আমি কেবলমাত্র এই নীতিতেই একমত যে, পবিত্র ঐশ্বরিকতার ধারনাই মূলত ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু, আর এই ঐশ্বরিকতার অস্তিত্ব বর্তমান আধুনিক ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের চিন্তাচেতনার মত অবাস্তব নয়।

মূলত এটি এক সহজজাত প্রবৃত্তি যা প্রতিটি মানুষের অভ্যান্তরে জন্মগত ভাবেই থাকে। মানুষ তার অভ্যন্তরীন অনুভূতির চাহিদা মাফিক কাউকে ঈশ্বর নির্বাচন করে তাঁর সম্মুখে নত হতে চায়। এই অনুভূতি প্রকাশের দু'টি রূপ রয়েছে। প্রথমটি হলো, একেশ্বরবাদ রূপে এবং দ্বিতীয়টি হলো, বহুশ্বরবাদ রূপে।

মানুষ যখন এক ঈশ্বরকে পবিত্রসত্তা হিসেবে মেনে নেয় এবং সেই এক ঈশ্বরকে নিজের প্রভু হিসেবে গ্রহন করে, তাঁর উপাসনা করে, তখন সে তার অনুভূতিকে যথার্থ রূপে ব্যবহার করে। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরই সর্বময় একক পবিত্রতার অধিকারী। আর এজন্য একমাত্র তাঁকেই পবিত্রতার ধারক বাহক হিসেবে মান্য করার অর্থ সেই মহান সত্যকে স্বীকৃতি দেওয়া।

কিন্তু যখনই কেউ কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে দৃশ্যত তার থেকে ভিন্নতর রূপে প্রত্যক্ষ করে, সাথে সাথে তাকে ঐশ্বরিকতার প্রতীক হিসেবে গ্রহন করে নিয়ে উপাসনায় লিপ্ত হয়, তখন সে তার সঠিক আত্মঅনুভুতির অপব্যবহার করে। আর এভাবেই একজন মানুষ প্রকৃত ঈশ্বরকে যে স্থান ও মর্যাদা দিতে চেয়েছিল

তা অনৈশ্বরকে প্রদান করে বসে। ধর্মীয় পরিভাষায় একেই বহুশ্বরবাদ বলে। সাধারণ ভাষায় আমরা এই বিষয়টিকে কুসংস্কার বলে থাকি।

এক ঈশ্বর ব্যতীত অন্য বস্তুকে পবিত্রতার ধারক জ্ঞান করার মত ভুলটিই মূলত প্রাচীন যুগে বিজ্ঞানের আত্মপ্রকাশের পথে হাজার বছরের বাধা হয়ে দাড়িয়েছিল। শুধুমাত্র একজনকেই ঈশ্বর হিসেবে মেনে নিলে বিজ্ঞান ও বুদ্ধিগত ভাবে কোন সমস্যার সৃষ্টি হতো না। কারন ঈশ্বর বিষয়টি আমাদের অধিকৃত ক্ষমতার যে সীমা, তার বাহিরের বিষয়। তিনি যেখানে থাকেন, সেখানে কোন মানুষ পৌঁছানোর ক্ষমতা রাখে না।

অন্য দিকে যে সমস্ত বস্তুকে ঐশ্বরিকতার ধারক হিসাবে গণ্য করা হয়, সেগুলি আমাদের ক্ষমতার সীমানার অধীনে অবস্থান করে। এই সকল বস্তুগুলো নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানের উন্মেষ ঘটেছে। কিন্তু এই বস্তুগুলিকে যখন স্রষ্ঠার স্থান দখল করে, তখন সেগুলি আর গবেষণা ও বিশ্লেষণের স্থানে থাকে না, উপাসনা ও ভক্তিশ্রদ্ধার বিষয়ে রূপান্তরিত হয়।

ঈশ্বর ব্যতীত এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সব কিছুই সৃষ্টবস্তু। তাই এগুলিই প্রকৃতির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট। ঐ বৈশিষ্টগুলিই বিজ্ঞান গবেষনার প্রধান উপাদান। এই সকল প্রাকৃতিক বস্তুগুলি নিয়ে গবেষণা করা এবং গবেষণার দ্বারা তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করাকেই সাইন্স বা বিজ্ঞান বলে।

যেহেতু প্রাচীন যুগের মানুষ এসকল দৃশ্যমান বস্তুকে ঈশ্বর হিসেবে গ্রহন করে নিয়েছিলে, সে জন্য এসকল বস্তু তাদের জন্য শুধুমাত্র উপাসনার বিষয়বস্তু হয়েই ছিলো। তা তাদের জন্য গবেষণা ও বিশ্লেষণের বস্তু হতে পারেনি। আর এই ভ্রষ্ট চেতনাই প্রাচীন যুগে বিজ্ঞানের আত্মপ্রকাশের পথে হাজার হাজার বছর ধরে বাধা হয়ে দাড়িয়ে ছিল। উন্নয়ন ও অগ্রগতির দরজা শুধু তখনই উন্মুক্ত হল যখন একত্ববাদের বিপ্লব মানুষের প্রাচীন ভ্রষ্ট মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করে দিল এবং এই সকল দৃশ্যমান বস্তুগুলিকে ঈশ্বরের স্থান থেকে সরাতে সক্ষম হলো।

একটি উপমা

প্রাচীনকালে বহুশ্বরবাদের যে বিশ্বব্যাপী প্রসার ছিল, তা বর্তমানে কেবলমাত্র ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং বিশেষত: নিরামিষবাদের উপর ভিত্তি করে পূর্ণ শক্তিমত্তা সহ আজও এখানে বিদ্যমান। যাইহোক, এটা লক্ষনীয় আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ ফলগুলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এখানে অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে।

১৯৬৭ সালে দিল্লির একটি ইংরেজি পত্রিকাতে একজন ভারতীয় বিজ্ঞানীর সাক্ষাৎকার ছাপা হয়। সেই সাক্ষাৎকারটি হঠাৎ করে দেশকে অস্থির করে তোলে। তাতে লেখা ছিলো, "অপুষ্টি ও প্রোটিণের ক্ষুধার চাহিদা বিষয়ক সমস্যাটি যদি খুব শিঘ্রই সমাধান না করা হয় তবে দুই দশকের মধ্যে ভারতকে বৃহৎ আকারে মেধা স্বল্পতার মত বিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে।" (Statesman, Delhi, 04-September-১৯৬৭) এই উক্তিটি ডা. এম. এস. স্বামী নাথানের (Dr. M. S. Swami Nathan) ছিল, যিনি সেই সময় ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট, দিল্লির (Director of the Indian Agricultural Institute, New Delhi) ডাইরেক্টর ছিলেন। তিনি আরও ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, সুষম পুষ্টির ধারণাটি নতুন ছিল না, তবে মস্তিষ্কের বিকাশের পক্ষে এর তাৎপর্য সাম্প্রতিক এক জৈবিক আবিষ্কার।

"এটা এখন স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, চার বছর বয়সে মানুষের মস্তিষ্ক তার পূর্ণ ওজনের ৮০% থেকে ৯০% পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং শিশুরা যদি এই গুরুত্বপূর্ণ সময়টিতে পর্যাপ্ত প্রোটিন না পায়, তবে মস্তিষ্ক সঠিক ভাবে বিকশিত হয় না। ডা. স্বামী নাথান আরও বলেন, যদি অপুষ্টি ও প্রোটিন বুভুক্ষা বিষয়ক সমস্যাটি নিরসনের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ না নেওয়া হয় তাহলে আগামী দুই দশকের মধ্যে এই দৃশ্য দেখতে হবে, যে একদিকে উন্নত দেশগুলির মেধা, শক্তি ও সমৃদ্ধি (Intellectual power) দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে আর অন্য দিকে আমাদের দেশে মেধার অপূর্ণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যুবক সম্প্রদায়কে প্রোটিনের স্বল্পতা থেকে

বের করে আনার জন্য যদি আমরা দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহন না করি তবে এমন এক ভয়াবহ পরিণতির উদ্ভব হবে যে, প্রত্যেকদিন আমাদের দেশে ১০ লক্ষ বুদ্ধি প্রতিবন্ধীর (Intellectual Dwarfs) জন্ম হবে। এর বড় একটি প্রভাব হয়তো এতদিনে আমাদের সমসাময়িক প্রজন্মের উপর পড়ে গিয়েছে। ডা.স্বামী নাথানকে প্রশ্ন করা হয়, এই সমস্যার সমাধানের উপায় কোন পথে? তিনি এই প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন,"সরকারের উচিত প্রোটিন চেতনার (Protein Consciousness) বার্তাটি জনগণের মধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া এবং জনমত গঠন করা।"

তিনি আরও ব্যাখ্যা করে বলেন, নিরামিষ খাবারের সাথে ডাল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিনের উৎস হিসেবে কাজ করে। তার সাথে দুধের মত প্রাণিজ পন্য গুলিও রাখা উচিত কারন এগুলির মধ্যে অতি উন্নত মানের প্রোটিন থাকে। প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা পরিমানগত ও গুনগত দিক থেকে খতিয়ে দেখতে হবে। প্রোটিনের উপাদান গুলির মধ্যে প্রায় ৮০টি অ্যামাইনো অ্যাসিড (Amino Acide) সাধারণত বিকাশের জন্য প্রয়োজন। তিনি আরও বলেছিলেন, নিরামিষ খাদ্যের মধ্যে বেশ কিছু প্রকার অ্যাসিড যেমন, লাইসিন (Lysine) এবং মিথিওনিন (Methionine) জাতীয় অ্যাসিডের ঘাটতি থাকে। যদিও জোয়ারে লিইউনির (Leueine in Jowar) আধিক্য নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে রোগের কারন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সেখানে জোয়ার ছিল প্রধান খাদ্য। যদিও প্রানীজ খাদ্যগুলির ব্যবহার বৃহৎ পরিসরে পছন্দনীয়, কিন্তু তার প্রাপ্তি অতি ব্যয় সাপেক্ষ। উদ্ভিজ্জ খাদ্যকে প্রাণীজ খাদ্যের ঘাটতি পূরনের জন্য ব্যবহার করতে হলে অধিক পরিমানে মূল্য অপচয় করতে হয়।[৩৫]

ডা. স্বামী নাথানের উক্ত সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হওয়ার পর ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬৭ সালে আরও একটি, Protein Hunger (প্রোটিন বুভুক্ষা) নামক সম্পাদকীয় বের করে। যার বিষয় বস্তু হল, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার যখন ধারাবাহিকতার সাথে খাদ্য শষ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রন নীতি গ্রহন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তখনও সন্দেহে থেকে যায় যে, দেশের সরকার সতর্ক থাকার পরও প্রোটিন বুভুক্ষার এই সমস্যাটি দূরীভূত হবে।

এগ্রিকালচার রিসার্চ ইন্সটিটিউটের ডাইরেক্টর ডা. স্বামী নাথান বলেছেন, খাদ্যশষ্যের উপর অত্যাধিক নির্ভরশীলতার কারনে হৃষ্টপুষ্ট লোকজনও অপুষ্টির শিকার হতে পারে। যেসকল মানুষ প্রোটিন বুভুক্ষায় ভুগবে তাদের শারিরীকভাবে অসুবিধার সাথে সাথে এর প্রভাব তাদের মেধার উপরও পড়বে এবং শিশুদের মেধা পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করতে পারবে না।

এই বিষয়টি সামনে রেখে বর্তমান গৃহীত কৃষি নীতির উপর আরও একবার দৃষ্টি দেওয়া উচিত। তবে মূল সমস্যাটি তো সেই সকল সীমাবদ্ধতার, যার মধ্যে সরকারকে কাজ করতে হবে। প্রথমতঃ কৃষি উৎপাদিত পন্য প্রাণীজ প্রোটিনে রূপান্তর করা অতি ব্যয় সাপেক্ষ কাজ। সরকার এরই মধ্যে সুষম খাদ্য এবং মাংস, ডিম, মাছ অধিক পরিমান ব্যবহার করার জন্য প্রচার অভিযান চালিয়েছে; কিন্তু জনগণ এরপরও তাদের খাদ্যাভাস পরিবর্তনে অতিমন্থরতা প্রদর্শন করেছে ।[৩৬]

ডা. স্বামী নাথানের এই বক্তব্য প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে গোটা ভারতবর্ষে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কিছু উগ্রবাদী সাম্প্রদায়িক দল তার পদত্যাগের দাবি জানিয়ে বলে, 'তার মত মানুষ মোটেই এ জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠানের সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত থাকার যোগ্য নয়।' এসব কিছু অবলোকন করার পর স্বামী নাথান একদম নিশ্চুপ হয়ে যান, দ্বিতীয় কোন কথা আর বলেন নি। ফলে বিষয়টি সেখানেই ধামা চাপা পড়ে যায়।

জনগণের এই তীব্র প্রতিক্রিয়ার কারন হলো, ভারতের ধর্মীয় রীতি মতে জীব হত্যা মহাপাপ। যেহেতু ডা. স্বামী নাথান প্রোটিন বুভুক্ষা দূর করতে আমিষ অর্থাৎ মাংস খেতে উৎসাহ দিয়েছেন, আর আমিষ খেতে হলে প্রাণী হত্যা করতে হবে, সেজন্য নিরামিষ ভোজী গোষ্ঠী এরূপ আচরণ করেন। তারা প্রাণী হত্যার পাপ থেকে বাঁচতে নিরামিষ ভোজনকে খাদ্যাভ্যাসে পরিণত করে, এই রীতি শত শত বছর ধরে টিকিয়ে রেখেছেন। বিশেষতঃ গোহত্যা কখনও সম্ভব নয়, কারন ধর্মীয় বিচারে এটা একটা ঐশ্বরিক মর্যাদা সম্পন্ন জীব। ঋগ্বেদের মধ্যে গাভীকে দেবী রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৭]

এই একটি উপমা থেকেই ধারণা পাওয়া যায় যে, বহুশ্বরবাদ কিভাবে মানব উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ, যেখানে অসংখ্য ও অগনিত সম্পদ এবং প্রাচুর্য রয়েছে। এতো প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত ভারত সঠিক অর্থে উন্নত দেশে রূপান্তরিত হতে পারেনি। আর এর প্রধান কারন বহুশ্বরবাদের বাধা তাদেরকে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে দিচ্ছে না। এই রাস্তা সেই সময় পর্যন্ত বন্ধ থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না দেশকে সকল অবাস্তব সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করা হবে।

বিজ্ঞানের সূত্রপাত

ইউরোপের ইতিহাসে খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে নিয়ে দশম শতাব্দী পর্যন্ত যে যুগ অতিবাহিত হয়েছে, সেই সময়কালটিকে অন্ধকার যুগ (Dark Ages) বলা হয়। এই সময়ে সমগ্র ইউরোপ সভ্যতা ও প্রগতিশীলতা থেকে বহুদূরে অবস্থান করছিল। ইউরোপের জন্য এটা ছিল বৌদ্ধিক অন্ধত্ব ও বর্বরতার অধ্যায়।[৩৮]

'অন্ধকার যুগ' শব্দটি প্রযোজ্য ছিলো শুধুমাত্র ইউরোপের জন্য, কারন ইউরোপ যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল তখন সমগ্র ইসলামের বিশ্ব সভ্যতার উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত ছিল। বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর History of Western Philosophy নামক বইতে লেখেন, ভারত থেকে শুরু করে স্পেন পর্যন্ত ইসলামের আলোকোজ্জ্বল সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছিল।[৩৯]

এই ইসলামী সভ্যতা যা সিসিলি ও স্পেন হয়ে ইউরোপে প্রবেশ করেছিলো, তা ইউরোপকে এমন ভাবে আলোড়িত করে যে পশ্চিম ইউরোপ থেকে দলে দলে শিক্ষার্থীরা স্পেনের ইসলামীক ইউনিভার্সিটিগুলোতে পড়াশোনা করার জন্য আসতে শুরু করে। মুসলিম সভ্যতা হতে অনেক মানুষ ইউরোপেও ছড়িয়ে যায়। যখন ইউরোপীয়গণ বুঝতে পারলো যে, মুসলিমগণ তাদের তুলনায় জ্ঞানের দিক থেকে অনেক অগ্রগামী হয়ে গিয়েছে, তখন তারা মুসলিমদের লিখিত গ্রন্থগুলি

ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা শুরু করে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা (১৯৮৪) এর বর্ণনা মতে, যে সকল ধ্রুপদী সাহিত্য ইউরোপের রেনেসাঁসকে উৎসাহিত করে, তার বেশির ভাগ মুসলিম গ্রন্থাগারগুলির আরবী পান্ডুলিপি ও বইগুলির অনুবাদ থেকে প্রাপ্ত।"[৪০]

বর্তমান যুগে অধিকাংশ পণ্ডিতগণ যথা গুস্তব লিবান, রবার্ট ব্রিফল্ট, জে এম রবার্ট, মন্ট গোমারি ওয়াট এ কথা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন যে, আরবদের গবেষণার দ্বারাই ইউরোপের আধুনিক বিজ্ঞানের যুগের সূচনা হয়েছে। সুতরাং এটা সর্বজনবিদিত সত্য যে, ইসলামই আধুনিক বিজ্ঞানের রূপকার। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, অন্যেরা যে ঘটনাকে 'মুসলিমদের ইতিহাস' বলে লিপিবদ্ধ করেছে, তা 'ইসলামের ইতিহাস' হিসেবে লিপিবদ্ধ হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। এই কৃতিত্ব মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার চেয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহের সঙ্গে সম্পৃক্ত করাই যথার্থ হবে।

কিছু উপমা

প্রাচীনযুগ গুলিতে বহুশ্বরবাদ বিশ্বাসের অংশ হিসেবে কিছু বস্তু বা জিনিসকে ঐশ্বরিক মর্যাদা সম্পন্ন হিসাবে মেনে নেওয়া হয়েছিল। আর এই মানসিকতাই বস্তু সম্পর্কে স্বাধীন ভাবে চিন্তা ও গবেষণার দরজাকে বন্ধ করে দিয়েছিল। এরূপ অবস্থায় একত্ববাদের বিপ্লব এসে ইতিহাসে প্রথমবার স্বাধীনভাবে চিন্তা ও গবেষণার পরিবেশ সৃষ্টি করে। বিনা দ্বিধায় প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে গবেষণা ও অনুসন্ধান শুরু করা হয়। আর এভাবেই এই একেশ্বরবাদী বিপ্লবের দ্বারা ইতিহাসের পাতায় প্রথমবার বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও গবেষণার সঠিক প্রক্রিয়ার ভিত্তি স্থাপিত হয়। যদিও ইসলামের পূর্বে বিচ্ছিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন দেশে কিছু উদীয়মান প্রতিভা বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিল। কিন্তু পরিবেশ ও স্থান উপযুক্ত না হওয়ার কারনে, তাদের গবেষণা অনুমোদন লাভ করে নি। ফলে তাদের সেই সকল কর্মের কোন অগ্রগতিও ঘটে নি।

সাধারণ ভাবে দুরবীন বা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের বিষয়টিই দেখা যাক। গ্যালিলিও (মৃত্যু-১৪৪২) কে এই দূরবীনের আবিষ্কারক হিসাবে গণ্য করা হয়। আবু ইসহাক ইবরাহীম বিন জুনদুব (Bbu Ishaq ibn Jundub) (মৃত্যু-৭৬৭) মহাকাশ নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। তিনি দূরের বস্তুকে দেখার জন্য বেশ কিছু মূলনীতি নির্ধারণ করেন এবং সেই মূলনীতি মোতাবেক একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্রও আবিষ্কার করেছিলেন। গ্যালিলিও সেই দূরবীক্ষণ যন্ত্রটিকে আরও উন্নততর করেছিলেন মাত্র। অতঃপর তা আরও উন্নততর হয়ে শেষ পর্যন্ত বর্তমান যুগের ইলেকট্রনিক্স দূরবীক্ষণ তৈরী হয়েছে।

বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; তবে প্রাচীন যুগগুলিতে কুসংস্কার ও অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের ফলে এই প্রকার ভিত্তি অর্জন করা সম্ভব হয়নি। জাবির ইবনে হাইয়ান (মৃত্যু- ৮১৭ খ্রীস্টাব্দ) এই পর্যবেক্ষনের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন এবং এই গুরুত্বের জন্য তিনি একে গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা শুরু করেন। তাঁর অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হতে থাকে এবং সেই লেখাগুলি অনুদিত হয়ে ইউরোপে পৌঁছে যায়। তাঁর দেখান পথেই চিন্তন প্রক্রিয়ার উন্নতি বিধান হতে থাকে এবং তা শেষ পর্যন্ত আধুনিক অর্থে গবেষনামূলক বিজ্ঞানের সূত্রপাত ঘটায়।

আবু আলী হাসান ইবনে আল হাইসাম (মৃত্যু-১০২১) ইতিহাসের প্রথম ব্যক্তি ছিলেন, যিনি বিশ্বকে The Theory of Inertia in material bodies বা বস্তুর জাড্যধর্ম সম্পর্কে ধারনা প্রদান করেন। তাঁর এই গবেষণাটিও অনুদিত হয়ে ইউরোপে পৌঁছে যায়। ইউরোপের বিজ্ঞানীরা এই বিষয়টি গভীর ভাবে অধ্যায়ন করে এবং তার উপর আরও ব্যাপক গবেষণা চালায়। অনেক পরে তা 'নিউটনের গতিসূত্র' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সেখানে বলা হয় - বাইরে থেকে প্রযুক্ত বল দ্বারা বাধ্য না করলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকবে আর গতিশীল বস্তু সমবেগে সরল রেখায় গতিশীল থাকবে। আবার ইবনে আল হাইসাম সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন যে, আলো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার জন্য এমন এক পথ নির্বাচন করে যাতে সব থেকে কম সময় ব্যবহৃত হয়। আর এই আবিষ্কারই বর্তমান যুগে Fermat's Principle বা ফার্মেটের মূলনীতি নামে প্রসিদ্ধ।

পৃথিবীর বয়স

পৃথিবীতে মানব জাতির উত্থানের সঠিক সময় ও তারিখ সম্পর্কে বিজ্ঞান নির্দিষ্ট কোন মতামত প্রদান করতে পারেনি। তবে তারা এমন কিছু মানব কঙ্কালের কাঠামো খুঁজে পেয়েছে যার উপর ভিত্তি করে তাদের ধারণা যে সেগুলি খ্রীস্টপূর্ব দশ হাজারের সাথে সম্পর্কিত অথবা সহজ কথায় পৃথিবীর বয়স খ্রীস্টের বয়সের চেয়ে দশ হাজার বছরেরও বেশি। আর এই তথ্যের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা বাইবেলের বর্ণিত মতকে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। পবিত্র বাইবেলের 'দ্যা বুক অফ জেনেসিসের' মধ্যে মানব প্রজন্মের যে তারিখ বা সময় বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে পৃথিবীতে অ্যাডাম (আঃ) এর আত্মপ্রকাশ বা অবতরণ ঈসা মাসিহ (আঃ) এর থেকে ৩৭ শত বছর পূর্বে হয়েছিলো। ওল্ড টেস্টামেন্টের উপাত্ত গুলি সূক্ষ্মভাবে অনুসরণ করে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে হিব্রু (ইহুদি) ক্যালেন্ডারের তারিখ সমূহ স্থাপন করা হয়েছে। খ্রিস্টীয় ১৯৭৫ সালের দ্বিতীয় অর্ধে হিব্রু ৫৭৩৬ সালের সূচনা হয়, যার অর্থ পৃথিবী ৫৭৩৬ বছর পূর্বে সৃষ্টি হয়েছিল। আধুনিক বিজ্ঞান অনুসারে তথ্যটি সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য।

বাইবেলের তথ্যানুসারে খ্রীষ্টানগণ পৃথিবীর বয়স কয়েক হাজার বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন।এই সকল বিভ্রান্ত ও অবৈজ্ঞানিক তথ্যের বাস্তব রূপ অষ্টাদশ শতাব্দীতে জেমস হটন (James Hutton) এর গবেষণা থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। জেমস হটন একজন প্রসিদ্ধ Geologist বা ভূবিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি তাঁর সমগ্র জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন ভুমি ও পাথর নিয়ে গবেষণায়। তিনি প্রমান করেন যে, পৃথিবী তার বর্তমান এই রূপে এসে পৌঁছাতে লক্ষ বছরের বিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছে।

অতঃপর উনবিংশ শতকে চার্লস লাইল (Charles Lyell) এর পর্যবেক্ষণগুলি জেমস হটনের তত্ত্বটিকে নিশ্চিত করে। তাঁর লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থ প্রিন্সিপাল অফ জিওলজি (Principles of Geology) এর প্রথম খন্ড ১৮৩০

সালে প্রথম মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর বাইবেলে বর্ণিত ঐতিহাসিক সময় গণনার পরিমাপ একক সকল আলোচনার ক্ষেত্র থেকে আদৃশ্য হতে শুরু করে। বাস্তবিকভাবে, চালর্স লাইলের গ্রন্থগুলি বিশ্বজগতকে বহুলাংশে বোঝাতে সফল হয়েছিল যে বাইবেলের তথ্য ভুল হতে পারে; আর যাই হোক না কেন, এযাবৎ এটা একটা অচিন্তনীয় ব্যাপার ছিল।[৪১]

বাইবেলের এমনতর দৃষ্টিভঙ্গিই মুলত ইউরোপের জ্ঞান সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে যায়। তৎকালীন যুগে যে ব্যক্তির বক্তব্য বা কথা বাইবেলে বর্ণিত মত থেকে ব্যাতিক্রম হত, সেই সকল দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্যকে অপবিত্র দৃষ্টিভঙ্গি ও বিদ্যা হিসেবে ঘোষণা করে ঐ মতের প্রবক্তাকে অমার্জনীয় অপরাধের অধিকারী ঘোষণা করা হত। অন্যদিকে ইসলামের সূচনা থেকে তার অভ্যন্তরে এ জাতীয় কোন দৃষ্টিভঙ্গির লেশ মাত্র ছিল না। সেই জন্য ইসলামী স্পেনে যখন বৈজ্ঞানিক গবেষনার সূত্রপাত ঘটে তখন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের কোনরূপ বাধা ও বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় নি।

গ্রিক বিজ্ঞান

ইউরোপে আধুনিক যুগের অগ্রগতি চৌদ্দ থেকে ষোল শতকের মধ্যে শুরু হয়েছিল। আর এই সময়টিকেই ইউরোপের রেনেসাঁসের যুগ বলা হয়। রেনেসাঁস এর অর্থ হল পুনর্জাগরণ (Revivel) বা পুনর্জীবন (Rebrith)। এই নব জাগরণের যুগকে ইউরোপীয়গণ ইউরোপের একটি দেশ গ্রীসের সাথে সংযুক্ত করে। ইউরোপের আধুনিক যুগকে তারা মূলত প্রাচীন গ্রিক বিদ্যার পুনর্জাগরণ হিসেবে উপস্থাপন করে। প্রকৃতপক্ষে, ইউরোপে মোটেই পুনর্জাগরণ বা পুনর্জীবন হয়নি বরং ইউরোপে পরিবর্তনের জাগরণ হয়েছিল। আর তা ইউরোপের ইতিহাসে একবারই সংঘটিত হয়েছিল। বর্তমান পণ্ডিতগণ পশ্চিমাদের এই নব জাগরণকে সরাসরি আরব মুসলিমদের উপহার বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।

ব্রিফল্ট (Briffault) লেখেন,

আমাদের বিজ্ঞানের জন্য আরবদের উপহার শুধু এতটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় যে, তারা আমাদেরকে শুধুমাত্র বিপ্লবী চিন্তা ও চেতনা প্রদান করেছে। বিজ্ঞান বহুলাংশে আরবীয় সংস্কৃতির উপর ঋণী। তা (বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞান) নিজ অস্তিত্বে আসার জন্য আরবীয়দের নিকট ঋণী।[৪২]

তিনি আরও বলেন, সম্ভবতঃ আরবীয়দের ছাড়া আধুনিক শিল্পোন্নয়ন কখনই সম্ভব হত না।[৪৩]

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা (১৯৮৪) এর মতে, মুসলিম সমাজে গ্রন্থাগারগুলি গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হতো। এমন অনেক প্রতিষ্ঠান ছিল যাদের গ্রন্থের পরিমান এক লক্ষেরও অধিক ছিল। আর যে সকল ধ্রুপদি সাহিত্যের দ্বারা সমগ্র ইউরোপে রেনেসাঁসের জন্ম হয়, তার বৃহৎ একটি অংশ ঐ সকল মুসলিম গ্রন্থাগারগুলির আরবি গ্রন্থের অনুবাদ থেকে এসেছিল।[৪৪]

কারও কারও মতে, আরবীয়দের কৃতিত্ব হল, তাদের কৃত অনুবাদগুলির দ্বারা গ্রিক বিজ্ঞানকে ইউরোপ পর্যন্ত সঞ্চারণ করা। অধ্যাপক প্রফেসর হিট্টি লিখেছেনঃ

গ্রিক সভ্যতার ধারা বা গ্রিক সংস্কৃতির গতি আরবদের মাধ্যমে স্পেন ও সিসিলির পথ হয়ে ইউরোপের দিকে ঘুরে যায় এবং এটি ইউরোপের নব জাগরণ ঘটাতে সহায়ক হয়।[৪৫]

তবে এ জাতীয় বক্তব্যও সঠিক নয়। গ্রিক দার্শনিকদের নিকট থেকে আরবীয়গণ যা পেয়েছিল তা পরীক্ষা মূলক জ্ঞান ছিল না বরং তা ছিল তাত্ত্বিক যুক্তি। অর্থাৎ, গ্রিকদের নিকট থেকে যা তারা পেয়েছিলো তা বিজ্ঞান নয় বরং তা ছিল দর্শন। যে জিনিসকে বর্তমানে আমরা বিজ্ঞান হিসেবে জানি তা গ্রীসে কখনো, কোনদিনই ছিল না। বিজ্ঞান বা পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে জ্ঞান অর্জনের পন্থাটি মুসলিমদের দ্বারা উদ্ভাবিত। মুসলিমরাই সর্ব প্রথম পর্যবেক্ষন ও গবেষণার মাধ্যমে

জ্ঞান অর্জন করেছিল এবং পরে তা অন্যান্য জাতি বিশেষ করে ইউরোপীয়দের নিকট পৌঁছে দিয়েছিল।

বার্ট্যান্ড রাসেল (Bertrand Russell) যথার্থই লিখেছেনঃ

আরবদের সময় পর্যন্ত বিজ্ঞানের দুই ধরণের কার্যকারিতা ছিল, প্রথমতঃ বস্তুকে জানার জন্য নিজেকে উপযুক্ত করা এবং দ্বিতীয়তঃ কর্ম সম্পাদনের জন্য নিজেকে উপযুক্ত করা। আর্কিমিডিস ব্যতীত গ্রিকরা কেবল উল্লেখিত দুটি কর্মের মধ্যে প্রথমটির উপরই আগ্রহী ছিল, বিজ্ঞানের ব্যবহারিক কার্যে ব্যবহারের প্রতি আগ্রহ কুসংস্কার ও যাদুবিদ্যার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল।[৪৬]

বার্ট্যান্ড রাসেল আরও লেখেনঃ

আজ একজন উচ্চ শিক্ষিত মানুষের নিকট এই বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে অনুভূত হয় যে, কোন প্রাচীন মতকে অন্ধ ভাবে গ্রহন না করে, পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সুনিশ্চিত হয়ে গ্রহণ করতে হবে। সম্পূর্ণরূপে এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী খুব সম্ভবত সপ্তদশ শতকের পূর্বেই খুব কমই বিদ্যমান ছিল। এরিস্টটল দাবি করেছিলেন, পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের মুখে দাঁতের সংখ্যা কম। যদিও এরিস্টটল দুই দুইটি বিবাহ করেছিলেন, তারপরও তিনি একটু কষ্ট করে তার নিজ স্ত্রীদের মুখ খুলে দাঁতগুলি দেখে মতামত প্রদান করেন নি।[৪৭]

বার্ট্যান্ড রাসেল এইরূপ আরও বেশ কিছু উপমা পেশ করে লেখেন, এরিস্টটল কোন কোন বিষয়ে গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ ছাড়াই এমন বেশ কিছু মত প্রকাশ করেন যা, তার পরবর্তী অনুসারীরা উক্ত মতামত গুলোকে বিনা পর্যবেক্ষনে পুনরাবৃত্তি করতেই থাকে।

বিজ্ঞানের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বস্তুর প্রকৃতি সম্পর্কে জানার জন্য গভীরভাবে সেই বস্তুটি নিয়ে গবেষণা ও পর্যবেক্ষন করা। কিন্তু গ্রিক এবং অন্যান্য প্রাচীন জাতি গুলির মধ্যে সেই পরিবেশ ও মানসিকতা (একদমই) ছিল না। কারন ঈশ্বর ব্যতীত অন্য সকল বস্তুকে পবিত্রতার ধারক হিসেবে মান্য করার ফলে এমন হয়েছিল যে, সেই সকল বস্তুগুলি মানুষের চোখের সামনে পবিত্র

এবং পূজনীয় হয়ে উঠেছিল। আর এর ফল হিসেবে, প্রতিটি জাতির অভ্যন্তরে যাদু, কুসংস্কার এবং বিভিন্ন দেব দেবতার উপাসনা বিস্তৃত পরিসরে প্রসারিত ছিল।

যদি মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে এ জাতীয় বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে থাকে যে, সকল ঘটনা যাদু দ্বারা সম্পাদিত হয় অথবা বস্তুর ভেতরে রহস্যময় প্রকৃতির ঐশ্বরিক গুনাবলি লুকিয়ে রয়েছে তখন ঐ সকল ঘটনা বা বস্তু নিয়ে গবেষণা করার ভাবনা উদিত হওয়া মোটেই সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক ভাবেই যাদু ও কুসংস্কারের মানসিকতা বিকাশ লাভ করে।

প্রাচীন যুগে স্বয়ং আরবগণও এ জাতীয় অন্ধকার ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল। আর এই সকল কুসংস্কার তাদের জন্য অন্যান্য জাতির মত বৌদ্ধিক ও মানসিক অবরোধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামের মাধ্যমে যখন তাদের মধ্যে চেতনার বিপ্লব জাগ্রত হল, তখন তাদের ভেতর থেকে ঐ সকল মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যায়। তারপর থেকে তারা বস্তুকে শুধু বস্তুরূপেই দেখা শুরু করে অথচ তার পূর্বে তারা ঐ সকল বস্তুকে পবিত্র ও রহস্যময় রূপে দেখতো। এই চেতনার বিপ্লব আরবীয়দের মাঝে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক মনষ্কতা সৃষ্টি করে। মানব ইতিহাসে এমন ঘটনা এটাই সর্ব প্রথম। আর বিশ্বব্যাপী এই চিন্তারেখাটি ছড়িয়ে দিয়ে তারা দানকারী মানুষে পরিনত হয়। তারা সমগ্র বিশ্বকে যা দান করেছে, বর্তমান যুগে তাকে আমরা বিজ্ঞান নামে অভিহিত করি।

প্রকৃতি বিজ্ঞান

বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়োনবি (Arnold Toynbee) বলেন, বিজ্ঞান হল প্রকৃতিকে পূর্ণরূপে কাজে লাগানোর অপর একটি নাম। অতঃপর তিনি নিজেই এই প্রশ্নটি উত্থাপন করেন যে, প্রাকৃতিকে ব্যবহার করার এই কলা কৌশলগুলি লক্ষ কোটি বছর পূর্ব থেকে আমাদের এই জগতে বিদ্যামান থাকা সত্ত্বেও কেন তাকে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহারের জন্য বর্তমান অবস্থানে

আনয়ন করতে এতো সময় অতিবাহিত হলো? প্রশ্নটি উত্থাপন করে নিজেই তার জবাব দিচ্ছেন এই ভাবে যে, প্রাচীন যুগে প্রকৃতি ছিল মানুষের জন্য পুজনীয় বা উপাসনার বস্তু। আর যে জিনিসকে মানুষ একবার উপাসনার বস্তুতে রূপান্তর করে পরবর্তীতে তা নিয়ে গবেষণা ও বিশ্লেষণ করার সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। আর্নল্ড টয়োনবি স্পষ্ট ভাবেই ব্যক্ত করেন যে, প্রাচীন যুগের মানুষদের জন্য প্রকৃতি শুধুমাত্র প্রাকৃতিক ধন-সম্পদের ভান্ডার ছিল না বরং তা ছিল তাদের নিকট দেবী (Goddess), ধরিত্রী মাতা (Mother Earth)। পৃথিবীর উপরিভাগের অবস্থিত উদ্ভিদ সমূহ, ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে সঞ্চারমান সকল প্রাণী ও পৃথিবীর অভ্যান্তরে লুক্কায়িত খনিজপদার্থ ও ধনসম্পদ সকল কিছুই ছিল ঐশ্বরিক প্রকৃতির অংশ। সেজন্য সকল প্রকার প্রাকৃতিক বিষয় সমূহ (Natures Phenomena) যথা ঝর্ণা, নদী, সমুদ্র, পাহাড়, বজ্রপাত,ভূমিকম্প ইত্যাদি সব কিছুই ছিল ঐশ্বরিক প্রকৃতির আধার। আর এটিই ছিল সেই সময়কার জাতি ও সভ্যতার একমাত্র ধর্ম বিশ্বাস।[৪৮]

যখন মানুষ প্রকৃতিকে উপাস্য হিসাবে জ্ঞান করে, তাকে সে কখনোই গবেষণা, বিশ্লেষণ ও ব্যবহারের বস্তু হিসেবে কল্পনা করতেই পারে না। টয়োনবি আরও বলেন, প্রকৃতিকে পবিত্র (Holy) জ্ঞান করার সেই যুগটির অবসান ঘটানো একমাত্র একেশ্বরবাদী ধর্মীয় বিশ্বাসের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। একেশ্বরবাদের ধারনা প্রকৃতিকে দেবতার স্থান থেকে সরিয়ে সৃষ্টির স্থানে নামিয়ে আনে। এখন প্রকৃতিকে উপাস্য হিসাবে গণ্য করার বদলে গবেষণা ও বিশ্লেষণের বস্তুতে রূপান্তরিত হয়েছে।

একেশ্বরবাদী বা তাওহীদের এই মতাদর্শ অতীত যুগে আগত সকল পয়গম্বরগণ তাদের নিজ নিজ জাতির নিকট উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু সেই আন্দোলন শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ঘোষণার মাঝে সীমাবদ্ধ থেকে যায়। তা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলন বা বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হয় নি। ইসলামের সর্বশেষ পয়গম্বর এবং তাঁর বিশ্বস্ত সঙ্গীদের নজিরবিহীন প্রচেষ্টা দ্বারা একত্ববাদের এই বিশ্বাস ব্যপক ভাবে সর্বস্তরে ছড়িয়ে যায়। শেষপর্যন্ত তার অবসম্ভাবী পরিনতি হিসেবে একসময় প্রকৃতি সম্পর্কে লালিত সেই চিরাচরিত ঐশ্বরিকতার ধারনা পরিপূর্ণ

ভাবে লোপ পায়। তারপর থেকেই মানুষ প্রকৃতিকে বিশ্লেষন ও ব্যবহারের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে শুরু করে। এই প্রক্রিয়া কখনও কয়েক শতাব্দী ধরে কখনও মন্থর কখনও দ্রুত গতিতে সামনের দিকে এগোতে থাকে, এমনকি একপর্যায়ে এসে তা বর্তমান বিজ্ঞানের স্বর্ণ যুগে প্রবেশ করে।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার (১৯৮৪) 'প্রকৃতি বিজ্ঞানের ইতিহাস' নামক প্রবন্ধে লেখা হয়েছে, গ্রিক বিজ্ঞান খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পরে ব্যাপক ঝুঁকির মুখে পড়েছিল, কারণ রোমানরা এতে মোটেই আগ্রহী ছিল না। সামাজিক চাপ, রাজনৈতিক নিপীড়ন ও গির্জার পাদ্রীদের ক্রমাগত বিরোধিতার ফলে গ্রিক বিজ্ঞানী ও গ্রিক দার্শনিকগণ নিজ মাতৃভূমি ত্যাগ করে পূর্ব দিকে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যখন ইসলামের উত্থান হয়, তখন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিষয় সমূহ চর্চার ক্ষেত্রে উৎসাহ দান করা হয়, ফলে বিতাড়িত ও নির্বাসিত ওই সকল বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদেরকে স্বাগত জানানো হয়। গ্রিক ভাষায় লিখিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলির অধিকাংশ আরবিতে অনুদিত হয়ে সংরক্ষিত হতে থাকে। আরবীয়গণ গ্রিক বিজ্ঞানের মূল ভিত্তির পরিবর্তন না ঘটিয়ে তার মধ্যে সাধারণ কাঠামোগত কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের বৃদ্ধি ও সংযোজন করে। দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপে গ্রিক বিদ্যা শিক্ষার প্রতি আগ্রহ যখন পুনর্জাগরিত হয় তখন ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা, বিজ্ঞান শেখার জন্য দলে দলে স্পেনে আগমন করতে শুরু করে। আরবিতে অনুদিত গ্রন্থগুলির ল্যাটিন অনুবাদ থেকে পশ্চিম ইউরোপে বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন ঘটে। মধ্য যুগের বিজ্ঞানীরা পরিশীলনের উচ্চ স্তরে পৌঁছে যায় এবং ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে তার ধারাবাহিকতাই বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের জন্য ভিত্তি প্রস্তুত করেছিল।[৪৯]

মোসিয়লেবান (Moseoleban) তাঁর লিখিত 'Arab Civilization' নামক বইতে দাবি করেন, আরব বিজ্ঞান ক্রুসেডের মাধ্যমে নয় বরং আন্দালুস (স্পেন), সিসিলি এবং ইতালি হয়ে ইউরোপে পৌঁছে ছিল। ১৩৩০ সালে রিমন্ড অফ টেলটলার (Remond of Teletalar) এর নেতৃত্বে বা পৃষ্ঠপোষকতায় বেশ কিছু অনুবাদকদের সমন্বয়ে একটি অনুবাদ পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। যাদের কাজ ছিল শুধুমাত্র আরবিতে লিখিত বিভিন্ন বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ

করা। আর সেই সকল অনুবাদগুলির দ্বারাই ইউরোপের সামনে এক নতুন জগৎ উন্মোচিত হয়। চতুর্দশ শতক অবধি এই অনুবাদ কার্যক্রম এক নাগাড়ে অব্যাহত থাকে। তারা শুধুমাত্র আর রাযি, ইবনে সিনা, ইবনে রুশদদের রচিত গ্রন্থগুলিই নয় সেই সাথে তারা গ্যালেন, হিপোক্রেটিস, প্লোটো,অ্যারিস্টটল, ইউক্লিডস, টলেমী প্রমুখ ব্যক্তিগণের রচিত গ্রন্থগুলি ও আরবি থেকে ল্যাটিনে অনুবাদ করে ফেলে।

অন্যান্য পশ্চিমা বিজ্ঞানীরা এই স্পষ্ট ও ঐতিহাসিক বিষয়গুলিকে আরও খোলাখুলি ভাবে উপস্থাপন করে গিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, রবার্ট ব্রিফল্ট (Robert Briffault) লিখেছেন, গ্রিকরা সিস্টেম বা পদ্ধতি তৈরি করে তার ব্যাপকতা ও মূলনীতি নির্ধারণ করেছিল কিন্তু সেটা নিয়ে ব্যবহারিক গবেষণা ও বিশ্লেষণের মত দীর্ঘ এবং কঠোর পরিশ্রম করতে প্রস্তুত ছিল না। 'বৈজ্ঞানিক আগ্রগতির ইতিহাস' লেখক জর্জ সার্টন বলেন - যে জিনিসকে আজ আমরা বিজ্ঞান বলি তা নব অভিজ্ঞতালব্ধ, পরিশ্রমলব্ধ ও গাণিতিক পদ্ধতির ফলাফল স্বরূপ জন্ম নিয়েছে। আর এসমস্ত কিছু মুসলমানদের দ্বারাই বাস্তবায়িত হয়েছে।

অনুসন্ধানের এই মানসিকতা দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী ছিল এবং তা আরবীয়দের দ্বারা ইউরোপে সঞ্চারিত হয়। এ কথা অনস্বীকার্য যে আধুনিক বিজ্ঞান ইসলামী সভ্যতার উত্তরাধিকার বহন করে।

বিশ্ব মানবতাকে ইসলামের উপহার

ইসলাম বিশ্ব মানবতার জন্য দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। প্রথম অবদানটি হল - অগ্রগতির পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী সকল প্রকার মানসিক অবরুদ্ধতাকে (Mental block) স্থায়ী ভাবে অপসারণ করেছে। দ্বিতীয় অবদান হল - ব্যবহারিক ভিত্তিতে অগ্রগতির নতুন যুগের সূচনা করেছে।

মানব মস্তিষ্কের অবরোধ বা মানসিক অবরুদ্ধতাকে সরিয়ে দেওয়ার অর্থ হল, মানব মনে সৃষ্ট বস্তু সম্পর্কে দখল হয়ে থাকা ঐশ্বরিকতাপূর্ণ চিন্তাদর্শন থেকে মুক্তি লাভ। নিঃসন্দেহে এটি একটি সর্ব বৃহৎ কঠিন কাজ ছিল। এই কার্যটি

মহান পয়গম্বর এবং তৎপরবর্তী বিশ্বস্ত সাথীদের (খলিফা) যুগে পূর্ণতায় পৌঁছায়।

এই কার্যের সূচনা যদিও প্রথম যুগেই সূচিত হয়েছিল, তদুপরি তার সুশৃঙ্খল বিকাশসাধন আব্বাসী খিলাফতের যুগে ৮৩২ সালে 'বাইত আল হিকমা' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে শুরু হয়। তারপর স্পেন এবং সিসিলিতে আরবগণের শাসন আমলে এই কার্য আরও শক্তি সামর্থ নিয়ে এগিয়ে যেতে যাকে। অতঃপর তা সেখান থেকে ইউরোপে পৌঁছে আধুনিক শিল্পবিপ্লবের সূচনা ঘটায়।

আর এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, বর্তমানের বহুমুখী উন্নয়ন মূলত শিল্পবিপ্লবের থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। এটি সত্য যে, সকল প্রকারের উন্নয়ন এখান থেকে উদ্ভুত হয়েছে। আর শিল্প বিপ্লব হলো,পৃথিবীর অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা শক্তিকে ব্যবহারের আর এক নাম। মানুষ কয়লার খনি খনন করে এবং কয়লাকে এনার্জি বা শক্তিতে রূপান্তরিত করে। তারা প্রবাহিত জলধারাকে বশ মানিয়ে তা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। তারা ভূগর্ভে লুকিয়ে থাকা খনিজ সম্পদ বের করে বিভিন্ন যন্ত্র বানায়। আর এভাবেই ধীরে-ধীরে শিল্পবিপ্লবের যুগ অস্তিত্বে আসে।

এখন একটি প্রশ্ন মনে জাগতে পারে, এই সকল জিনিস পৃথিবীর অভ্যন্তরে এবং বাহিরে লক্ষ লক্ষ বছর পূর্ব থেকেই মজুদ ছিল কিন্তু ইসলাম আগমনের পূর্বে মানুষ কেন এই সকল জিনিস ব্যবহার করতে পারেনি? এই প্রশ্নের একটিই মাত্র জবাব, বহুশ্বরবাদ বা শিরক এই কাজে সব থেকে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বহুশ্বরবাদ বা শিরক কি? শিরক হলো, সৃষ্ট প্রকৃতিকে উপাসনার বস্তুতে রূপান্তর করা। ইসলামের পয়গম্বরের সময় কালের পূর্বের সকল যুগের মানুষই প্রকাশ্য প্রকৃতিকে উপাস্য নির্ধারণ করে তার উপাসনায় লিপ্ত ছিল। গ্রিক সভ্যতা, মিশরীয় সভ্যতা, রোমান সভ্যতা, ইরানি সভ্যতা সহ সকল প্রাচীন সভ্যতা মূলত বহুশ্বরবাদী ছিল। সৃষ্টির সকল জিনিস যেমন, পৃথিবী, নদী, পর্বত, সূর্য, চন্দ্র, তারকা এসব কিছুই ছিল তাদের উপাস্য বা উপাসনার বস্তু। ইসলামই সর্ব প্রথম এই সকল বস্তুকে উপাসনার স্থান থেকে অপসারণ করে। আর তখন থেকেই এক নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের সূচনা হয় যাকে আমরা বিজ্ঞানের বিপ্লব বলে থাকি।

তৃতীয় অধ্যায়

জ্ঞান বিজ্ঞানে মুসলিমদের অবদান

বিজ্ঞানের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য স্বাধীন ভাবে গবেষণা করার মত পরিবেশ একান্ত প্রয়োজন। পূর্ববর্তী যুগগুলিতে বিভিন্ন প্রকারের সৃষ্ট মানব বিশ্বাসের জন্য স্বাধীন গবেষণার পরিবেশ বিরল হয়ে গিয়েছিল। আর এজন্য পূর্ববর্তী যুগগুলি ক্রমান্বয়ে এমন স্তরে পৌঁছে ছিল যে, একজন জ্ঞানবান মানুষ তার মেধাকে কাজে লাগিয়ে গবেষণার দ্বারা কোন ভাবে যদি সত্যতা বা বাস্তবতার নিকটে পৌঁছাতে সক্ষমও হতো এবং তার চিন্তাধারা মানুষের নিকট প্রকাশ করতো, তখন তার বক্তব্য প্রাচীণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভাবধারা থেকে ভিন্ন দেখে সকলেই তার বিরোধিতা শুরু করতো। এর ফলে উদ্ভাবনী নব চিন্তা, দর্শণের অগ্রগতি পথ হারিয়ে ফেলতো বা স্থগিত হয়ে যেত।

প্রাচীন যুগে উদ্ভাবনী চিন্তা দর্শণগুলির দমন ও নিপীড়নমূলক উদাহরণের মধ্যে অন্যতম কুখ্যাত উদাহরণ হলো, গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস। খৃষ্টপূর্ব ৩৯৯ অব্দে সক্রেটিসকে জোরপূর্বক বিষ পান করিয়ে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করতে বাধ্য করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিলো, তিনি এথেন্স বাসিন্দাদের উপাসকগুলিকে উপেক্ষা করতেন, তিনি সেই প্রাচীন ধর্ম ও তার রীতিনীতিতে নব নব পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন এবং গ্রিক যুব সমাজের মানসিকতাকে নীতি ভ্রষ্ট করেছিলেন।

সপ্তদশ শতকের শেষ দিকের আরও একটি উদাহরণ হলো, ইটালির জ্যোতির্বিদ গ্যালিলিও। গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২) কোপার্নিকাস কর্তৃক প্রকাশিত মতবাদ - গ্রহগুলি সূর্যকে প্রদক্ষিন করে - সমর্থন করার জন্য রোমান গির্জাগুলি তাঁর কঠিন শত্রুতে রূপান্তরিত হয়। ধর্মীয় আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। তাঁকে গ্রেফতার করা হলে, তিনি বুঝতে পারেন তাঁকে মৃত্যুদন্ড ব্যতীত সহজ কোন শাস্তি দেওয়া হবে না। তাই তিনি ধর্মীয় আদালতে

(Inquisition) তাঁর অভিমত প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। তিনি রোমান চার্চের আদালতে ঘোষণা করেছিলেন ঃ

" আমি গ্যালিলিও, বয়স সত্তর, আপনাদের সম্মুখে নতজানু হয়ে পবিত্র বাইবেলকে সাক্ষী মেনে, তার উপর দুই হাত রেখে,আমি আমার ভুলের স্বীকারোক্তি প্রদান করছি এবং পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে পরিভ্রমণ করছে বলে যে মত আমি ব্যক্ত করেছিলাম তা থেকে নিজেকে চূড়ান্ত ভাবে অসম্পৃক্ত থাকার অঙ্গীকার করছি। উক্ত মতটিকে অস্বীকার করছি এবং সেই মতকে ঘৃণ্য ও শয়তানী মত বলে ঘোষনা করছি।"

এরূপ একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার মাধ্যমেই ইতিহাস নিস্তব্ধ হয় নি। সেই যুগগুলিতে খ্রিস্টান পাদ্রী বা পন্ডিতগণ এভাবেই একটা বুদ্ধিবৃত্তিক অবরোধ সৃষ্টি করে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারা সত্যের সন্ধান ও প্রাকৃতিক রহস্য উদ্ঘাটনের কার্যকলাপগুলি নিষিদ্ধ করে রেখেছিল। এমন ধরনের সকল শিক্ষাকে তারা অশিক্ষা, যাদু এবং শায়তানী বিদ্যা হিসেবে গণ্য করতো। এমনতর পরিস্থিতিতে গবেষণা ও অনুসন্ধানের কার্য ধারাকে সচল রাখা অসম্ভব ছিল। মধ্যযুগে কেবলমাত্র মুসলিমদের হাত ধরেই এই কর্মধারা নতুন গতি প্রাপ্ত হয়, তার কারণ কুরআন মানুষের মধ্যেকার সকল বুদ্ধিবৃত্তিক অবরোধ দূরীভূত করে দেয় যা এতদিন ধরে গ্যালিলিও এর মতো অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাসের মানুষদের কাছে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে রেখেছিল। ইসলামী বিপ্লবের পর সর্বপ্রথম মুসলিমগণই বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার জন্য উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী প্রদান করে। তাদের উৎসাহে বৈজ্ঞানিক গবেষণা অবিচ্ছেদ্য ও অপ্রতিরোদ্ধগতিতে পথ চলতে থাকে এবং তা শেষ পর্যন্ত বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞানের যুগ পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম হয়।

সৌরজগত

প্রাচীন গ্রিকে একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিল, যাকে অ্যারিস্টার্কাস (Aristarchus) বলা হত (তিনি টলেমীর পূর্বের বিজ্ঞানী ছিলেন)। তাঁর মৃত্যু হয় ২৭০ খ্রিস্ট পূর্বে। তিনি সৌরজগতের উপর গবেষণা করেছিলেন এবং খুব সম্ভবত

তিনিই প্রথম সূর্যকেন্দ্রিক (Heliocentric) মতের প্রবক্তা ছিলেন। অর্থাৎ, সূর্য কেন্দ্রে রয়েছে আর পৃথিবী তার চারপাশে প্রদক্ষিণ করছে। যাইহোক তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি বা আবিষ্কারটি মানুষের মধ্যে গ্রহণ যোগ্যতা পায়নি।

তারপর টলেমীর (Ptolemy) যুগ আসে। তিনি খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। টলেমী অ্যারিস্টাকার্সের বিপরীত পৃথিবী কেন্দ্রীক (Geocentric) মতবাদ বা চিন্তাধারার উদ্ভাবন ঘটান। অর্থাৎ পৃথিবী কেন্দ্রে রয়েছে এবং সূর্য তার চারপাশে প্রদক্ষিণ করছে।

মহাবিশ্বের এই ভূকেন্দ্রিক তত্ত্বটি খ্রিষ্টীয় পন্ডিত বা পাদ্রীদের ধর্ম বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, যার উপর ভিত্তি করে তারা ঈসা মাসীহ (আঃ) এর ধারণা সৃষ্টি করেছিল। আর ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে এশিয়া মাইনরের একটি শহর নিকাইয়াতে (Nicaea) অনুষ্ঠিত বিখ্যাত চার্চ কাউন্সিলে ধর্মবিশ্বাসগুলি অনুমোদন লাভ করে। কন্সটান্টাইন দ্যা গ্রেট (Constantine the Great, ২৪০-৩৩৭) খ্রিস্টধর্ম গ্রহনের পর এই ধর্ম সমগ্র রোমান অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বিপুল ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হয়ে খৃস্টানগন বিশেষত টলেমির তত্বকে পৃষ্টপোষকতা করে। অ্যারিস্টাকার্সের সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বটি, তাদের অনুমোদিত পৃথিবী কেন্দ্রিক তত্ত্বের প্রভাবে অতল অন্ধকারে তলিয়ে যায়।

পৃথিবী কেন্দ্রিক তত্ত্ব সম্পর্কে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা (১৯৮৪) তে বলা হয়, "মহাবিশ্ব বিজ্ঞান সম্পর্কে বিকল্প কোন মডেল না থাকার কারনে খ্রিস্টীয় ১৭ শতাব্দীর শেষ অবধি বিশ্বের প্রায় প্রতিটি স্থানে এই তত্ত্বটি শেখানো ও পড়ানো হত।"[৫০]

যেহেতু অনৈশ্বরিক সত্ত্বাকে ঐশ্বরিক সত্ত্বা বলে মনে করার মত ভ্রমাত্মক কর্মে মুসলিমগণ নিমজ্জিত ছিল না,তাই তারা সেই বিষয়টির উপর মুক্ত মানসিকতার সাথে, নিখাদ তত্ত্বগত জ্ঞান দ্বারা নিরীক্ষণ করে। মুসলিমগণ যখন আবিষ্কার করলো যে, (ভূ-কেন্দ্রিক তত্ত্ব হতে) হিলিওসেন্ট্রিক (সূর্য কেন্দ্রিক) তত্ত্বটি অধিক যুক্তিযুক্ত এবং বাস্তবসম্মত, তখন তারা কোনো প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই এই মতটি গ্রহণ করে।

এডওয়ার্ড ম্যাকনাল বার্নস (Edward McNall Burns) এই বিষয়ে লেখেন, 'অ্যারিস্টাকার্স দ্বারা বিকশিত হিলিওসেন্ট্রিক তত্ত্বটি যদিও চারশত বছর ধরে বিস্মৃতির অতলতলে তলিয়ে যায় তা আজ একটি প্রতিষ্ঠিত সত্যে পরিনত হয়েছে। টলেমীর জিওসেন্ট্রিক তত্ত্বটি বহু শতাব্দীর-পর-শতাব্দী মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। ১৪৯৬ খ্রিস্টাব্দে কোপারনিকাস, পৃথিবী জগতের বা মহাবিশ্বের কেন্দ্র নয় বলে মত ব্যক্ত করেন। জ্যোতির্বিদ্যায় দীর্ঘ সময় ধরে গবেষণায় লিপ্ত থেকে, শেষ পর্ষন্ত তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, গ্রহগুলি সূর্যের চারপাশে প্রদক্ষিণ করছে। তিনি বিষয়টি আবিষ্কার করার পরও চার্চ কতৃক আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে ১৫৪৩ সাল পর্যন্ত তার আবিষ্কারটি প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেন।

স্পেনের মুসলিমগণ অন্য কোন বিষয়কেই এতটা প্রাধান্য দিয়ে উদ্ভাবন করেননি যতটা না তারা করেছেন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। বাস্তবিক অর্থে বিজ্ঞানের এই ময়দানে তাদের সফলতা এমন এক আশ্চর্যজনক উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে ছিল যা তাদের পূর্বে পরিলক্ষিত হয়নি। তারা জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, চিকিৎসা বিজ্ঞান সহ অন্যান্য বিষয়ে যে উৎকর্ষতা অর্জন করেছিল, তার বর্ণনায় ম্যাকনাল বার্নস লেখেন, "অ্যারিস্টটলের প্রতি তাদের পূর্ণ শ্রদ্ধা থাকার পরও, পৃথিবী কেন্দ্রিক মহাবিশ্ব সংক্রান্ত অ্যারিস্টটলের তত্ত্বগুলি সমালোচনা করতে তারা দ্বিধা করেনি এবং তারা এই সম্ভাবনাকে স্বীকার করে যে, পৃথিবী তার অক্ষের উপর আবর্তিত হয় এবং সূর্যের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে।[৫১]

সৌরজগত সম্পর্কে মুসলিমদের সঠিক অনুমিতিতে পৌঁছানো শুধুমাত্র এজন্য সম্ভব হয়েছিল যে, ইসলাম শর্তযুক্ত চিন্তার দেওয়ালকে ভেঙে দেয় যা এ যাবৎ মানব জাতির মানসিক উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সকল কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতার পরিসমাপ্তি হতেই, মানুষের চিন্তা ও ভাবনার কাফেলা অভাবনীয় দ্রুততার সহিত সফর করতে শুরু করে এবং সেই কাফেলা শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে বর্তমান শতকের এক চমকপ্রদ কৃতিত্বের যুগে উত্তোরণ ঘটিয়ে দেয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞান

প্রতিটি যুগেই বিভিন্ন রোগে মানুষ আক্রান্ত হয়েছে। এজন্য প্রতিটি যুগেই কোন না কোন রূপে চিকিৎসা বিজ্ঞান বিদ্যমান ছিল। তবে প্রচীন যুগে কখনোই চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি ও অগ্রগতি হয়নি যতটা অগ্রগতি ও উন্নতি ইসলামের আগমনের পর হয়েছে এবং পরবর্তীতে আধুনিক যুগে হয়েছে।

কথিত আছে যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের সূচনাপটে প্রাচীন গ্রিকে দুজন মহান চিকিৎসকের জন্ম হয়। তাঁদের একজনের নাম হলো, হিপোক্রেটিস (Hippocrates) এবং দ্বিতীয় জনের নাম হলো, গ্যালেন (Galen)। হিপোক্রেটিসের যুগটি ছিলো খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দী। হিপোক্রেটিস সম্পর্কে ইতিহাসে খুব বেশি কিছু জানা যায় না। পরবর্তী সময়ের ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, হিপোক্রেটিস আনুমানিক ৪৬০ খ্রিস্টপূর্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৭৭ খ্রিস্টপূর্বে তাঁর মৃত্যু হয়। এমনকি কিছু কিছু দার্শনিকগণ তাঁর ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্পর্কেও সন্দেহ পোষণ করেন। দর্শন এবং চিকিৎসা বিষয়ক যতগুলি গ্রন্থে তার নাম রয়েছে, সেই সকল গ্রন্থ সম্পর্কেও সন্দেহ করে বলা হয় যে, এসকল গ্রন্থ মোটেও হিপোক্রেটিস দ্বারা লিখিত নয় বরং অন্য কোন ব্যক্তি লিখে হিপোক্রেটিস নামে চালিয়ে দিয়েছে।"[৫২]

গ্যালেনকে প্রাচীন যুগের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিসাবে বিবেচনা করা হয়। গ্যালেন আনুমানিক ১২৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং আনুমানিক ১৯৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। রোমে গ্যালেন অতিমাত্রায় বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং তাঁর অধিকাংশ লেখা ধ্বংস করে দেওয়া হয়। অবশিষ্ট লেখাগুলিও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত যদি না আরবগণ খ্রিষ্টীয় নবম শতকে তাঁর লেখাগুলি সংগ্রহ করে সেগুলিকে আরবি ভাষায় অনুবাদ না করতো। অতঃপর এগারো শতাব্দীতে উক্ত আরবি অনুবাদগুলি ইউরোপে পৌঁছায়। ইউরোপীয়রা উক্ত আরবি অনুবাদগুলি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা (১৯৮৪) তে গ্যালেন সম্পর্কে নিবন্ধটি এই বলে

সমাপ্ত করা হয়েছে-"গ্যালনের জীবনের শেষ বছরগুলি সম্পর্কে খুব অল্পই জানা যায়।"[৫৩]

এটি অনস্বীকার্য সত্য যে, প্রাচীন গ্রিসে এই বিষয়ে (বিজ্ঞান বিষয়ক) বেশ কিছু অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন এবং উচ্চতর চিন্তাভাবনাকারী ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু হিপোক্রেটিস এবং গ্যালেনের মত ব্যক্তিদের পরিণতি দেখে বোঝা যায়, প্রাচীন গ্রিসে সেই পরিবেশ ছিল না যার সহায়তায় এমনতর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের প্রসিদ্ধি অর্জিত হতে পারে অথবা চিকিৎসা বিজ্ঞান বিকাশ লাভ করতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস, বর্তমান অবস্থার মত খোলামেলা গবেষণা ও পর্যবেক্ষনের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। যেমন - অসুস্থ রোগীর রোগমুক্তি রহস্যময় অদৃশ্য শক্তির নিয়ন্ত্রনাধীন মনে করা হতো এবং উক্ত রোগ মুক্তির জন্য বৃক্ষ, লতাপাতা ও প্রাণীকে পবিত্র জ্ঞান করে উপাসনা করা হতো।

গ্রিসে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সূচনা ঈসা মাসিহ (আ.) এর আত্মপ্রকাশের প্রায় দুইশত বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আরও দুই শত বছর ধরে এটি বিকশিত হয়। আর এভাবেই গ্রিসের চিকিৎসা বিজ্ঞানের যুগটি প্রায় চার বা পাঁচশত বছর ধরে প্রসারিত হয়েছিলো। অতঃপর গ্রিসে এই বিদ্যা আর উন্নতি লাভ করতে পারেনি। গ্রিস ইউরোপের একটি দেশ হওয়া সত্ত্বেও অতি অদ্ভুত বিষয় হলো, গ্রিসের চিকিৎসা কার্যক্রমের অবশিষ্টাংশও ইউরোপে প্রসার লাভ করতে পারেনি অথবা আধুনিক পশ্চিমা চিকিৎসার আত্মপ্রকাশে অবদান রাখতে পারেনি। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীন গ্রিসের পরিবেশ চিকিৎসা বিজ্ঞান বা চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত ছিল না।

গ্রিসের চিকিৎসা বিজ্ঞান যা এক পর্যায়ের কিছু স্বতন্ত্র ব্যাক্তিবর্গের দ্বারা উৎপত্তি লাভ করে, সেই বিজ্ঞান তার নিজের উৎপত্তির পর প্রায় এক হাজার বছর পর্যন্ত অপরিচিত ভিনদেশী হিসেবে উপেক্ষিত হয়ে গ্রন্থের মাঝে অন্তরীণ হয়ে পড়েছিল। (যেহেতু সমাজ ও রাষ্ট্র এটিকে স্বীকৃতি দেয় নি তাই এই অবস্থা হয়েছিল)। শেষমেশ ইসলামের আগমনের পর আব্বাসিয়া খিলাফত (৭৫০-১২৫৮) আমলে সেই হাজার বছর পূর্বে লিখিত গ্রন্থগুলি আরবীতে অনুবাদ করা শুরু হয়।

সেই সাথে আরবীয়দের নিজস্ব (অভিজ্ঞতার আলোকে) মূলগ্রন্থের সংযোজন ও সংস্করণ দ্বারা সম্পাদিত হয়ে নতুন করে প্রকাশিত হতে শুরু করে। তারপরই এই বিজ্ঞান ইউরোপে পৌঁছে আধুনিক মেডিকেল সাইন্সে রূপান্তরিত হওয়ার সুযোগ পায়।

সেই সকল যুগের পরিবেশ এমন অনুপযুক্ত এবং প্রতিকুল ছিল যে, যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণায় লিপ্ত হত, তাকে কোনোভাবেই উৎসাহিত করা হতো না বরং তাকে তীব্র বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হত। যখনই ব্যাক্তিগত পর্যায়ে কেউ অনুরূপ বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপ শুরু করতো, আর সেই কার্যকলাপ যদি কতৃপক্ষের নজরে আসতো তখন তা অবিলম্বে ও অতি কঠোরতার সাথে দমন করা হত। তৎসময়ে জনগণ রোগ ও চিকিৎসা দেব-দেবীর সাথে সম্পর্ক যুক্ত করে রেখেছিল। এহেন পরিস্থিতিতে বৈজ্ঞানিক পন্থায় চিকিৎসার কথা জনগণের নিকট কিভাবে গ্রহণযোগ্যতা পাবে? ইসলামের দ্বারা যখন জগৎ জুড়ে একত্ববাদের বিপ্লব সংঘটিত হলো, তারপরই চিকিৎসা বিজ্ঞানের সেই দরজাটি খোলা সম্ভব হলো যা হাজার হাজার বছর ধরে বন্ধ হয়ে ছিল; এবং আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে তা চুড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করলো।

ইসলামের পয়গম্বর বলেছেনঃ মহান প্রভু মৃত্যু ছাড়া সমস্ত রোগের নিরাময় দান করেছেন (মুস্তাদরাক আল-হাকিম হাদীস নং ৮২২০)। মানবতার নবীর এই উক্তিটি ছিল মূলত বিপ্লবী নেতার বিপ্লবী ঘোষণা। যখন তিনি চিকিৎসা বিদ্যার বাস্তবতা সম্পর্কে এই ঘোষণা করলেন, তখন থেকেই এই বিদ্যা বাস্তব সম্মত ব্যবহারিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হল।

একটি উপমা

গুটিবসন্ত বা বসন্তক্ষত যাকে ইংরেজিতে Smallpox বলা হয়, এক সময় ভয়াবহ রোগ হিসেবে বিবেচিত হত। এই অতি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হলে সর্ব প্রথম জ্বর আসে এবং শরীর জুড়ে বসন্তের দানা গজাতে শুরু করে।

শৈত্যানুভাব, মাথা যন্ত্রণা, পিঠে ব্যাথা হল এই রোগের উপসর্গ। এটি একটি প্রাণঘাতী রোগ। যদি কোন মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর সুস্থ হয়, তারপরও সেই ব্যক্তির ত্বকে স্থায়ী ভাবে এই রোগের দাগ অবশিষ্ট থাকে।

সংগৃহীত তথ্যমতে, এই রোগটি খ্রিস্টপূর্ব ১১২২ সালে মিশরে উৎপত্তি লাভ করে। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। অতীতে এই রোগটি বিভিন্ন দেশে অতি ভয়াবহ রূপে দেখা দিত। অসংখ্য মানুষ এই রোগের শিকার হতো। মিশরের পঞ্চম ফ্যারাও বা Ramses-V যার মৃত্যু ১১৫৬ খ্রিস্টপূর্বে হয়েছিল। তার মমি মিশরের একটি পিরামিডের মধ্যে আবিষ্কৃত হয়। তার চেহারায় গুটি-বসন্তের দাগ দেখা যায়। তারপরও এই গুটি-বসন্তের বিষয়ে কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু করতে হাজার বছর অতিবাহিত হয়।[৫৪]

বর্তমানে আমরা জানতে পেরেছি যে, বসন্ত একটি ভাইরাস ঘটিত সংক্রামক ব্যাধি। পূর্ব থেকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে কিভাবে এই রোগ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, সেই পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে।

তবে এটা ভুলে গেলে চলবে না, এই চিকিৎসার বাস্তবতা সর্ব প্রথম খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীর পর অর্থাৎ ইসলাম আগমনের পর আবিষ্কৃত হয়। এই বিষয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে যার নাম উজ্জল হয়ে আছে তিনি হলেন, আল রাযী (Al-Razi)। তিনি (৮৬৫-৯২৫), ইরানের রেই (Ray) শহরে জন্মগ্রহন করেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি এই রোগ সংক্রান্ত বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং বিশ্লেষণ করার পর 'আল জুদ্রী ওয়া আল হাসবা' (Al Judri wa al Hasba) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তারপর উক্ত গ্রন্থটি প্রাচীন ইউরোপের ভাষায় অর্থাৎ ল্যাটিন ভাষায় ১৫৬৫ সালে অনুদিত হয়ে ভেনিসে (Venice) মুদ্রিত হয়। অতঃপর তা থেকে গ্রিক ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় অনুদিত হয়েছে এবং সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৪৮ সালে এই গ্রন্থটি ইংরেজিতে অনুবাদ 'A Treatise on the Smallpox and Measles'. নামে লন্ডনে প্রকাশিত হয়।

সকল বিশেষজ্ঞগণ এক বাক্যে মেনে নিতে বাধ্য হন যে, 'আল রাযীর লিখিত এই গ্রন্থটি সমগ্র মানব ইতিহাসে বসন্ত রোগের চিকিৎসা বিষয়ে লিখিত প্রথম গ্রন্থ।' এই গ্রন্থটির পূর্বে, কোন ব্যক্তি এই বিষয়ে গবেষণা বা গ্রন্থ রচনার কোনটাই করেনি।

ইংরেজ চিকিৎসক এডওয়ার্ড জেনার বা Edward Jenner (১৭৪৯-১৮২৩), যিনি বসন্তের টিকা আবিষ্কার করেন, আল রাযীর লেখা গ্রন্থটি অধ্যায়নের পরেই তিনি এই রোগ নিয়ে চিকিৎসা সংক্রান্ত অনুসন্ধান চালান। তারপর এক নাগাড়ে কুড়ি বছর এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করার পর তিনি গো-বসন্ত ও গুটি-বসন্তের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পান। অতঃপর ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে এর টিকা বা ভ্যাকসিনের ব্যবহারিক প্রয়োগ নিয়ে তিনি সর্বপ্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান এবং সফল হন। কোন কোন মহল থেকে তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও তার আবিস্কৃত পন্থাটি দ্রুত বিস্তার লাভ করে এবং ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রসংঘ সর্বপ্রথম ঘোষণা করে যে 'বর্তমানে আমরা বসন্ত রোগকে নির্মূল করতে পূর্ণরূপে সক্ষম হয়েছি।'

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে, বসন্তের প্রারম্ভিক আবিষ্কার থেকে শুরু করে এই রোগের নিরাময় সংক্রান্ত গবেষণা শুরু করতে এতো বছর সময় কেন অতিক্রান্ত হলো? এর উত্তর ঐ একটাই, আর তা হলো, বহুশ্বরবাদ বা শিরক এর ব্যাপকতা, অর্থাৎ পবিত্র নয় এমন কিছুকে পবিত্র জ্ঞান করা, অনৈশ্বরিক বিষয়কে ঐশ্বরিক গুণাবলীর আধার মনে করা।

ড. ডেভিড ওয়ারনার (Dr. David Werner) এর ভাষায়ঃ - ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় মানুষদের এই বিশ্বাস ছিলো যে, বসন্ত সহ অন্যান্য সকল মহামারী দেবতাদের অসন্তুষ্টির ফসল। তাদের ধারণা ছিলো, দেবতারা এসকল মহামারী প্রেরণের দ্বারা তাঁদের রাগ ও ক্ষোভ বর্হিপ্রকাশ করেন। এমন সকল ধর্মীয় বিশ্বাসের অনুগামী হওয়ার জন্য তাদের মানসিকতায় এমনতর বিশ্বাস স্থান দখল করে রেখেছিল যে, এই সকল মহামারী থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হল,দেবী ও দেবতাদের সন্তুষ্টি অর্জণের লক্ষ্যে তাদেরই পছন্দ মাফিক নৈবেদ্য বা নজরানা উৎসর্গ করা। তারা রোগাক্রান্তদের চিকিৎসার ব্যবস্থা তো করতোই না সেই সাথে খেতেও দিত না, তার কারণ হলো, তারা ভাবতো দেবতাগণ তাদের প্রতি

অপ্রশমিত ক্ষোভে ফেটে পড়বেন। সেই জন্য অসুস্থ শিশু দুর্বল হয়ে পড়তো এবং তার ফলে হয় সে মারা যেত, কিংবা দীর্ঘ রোগভোগের পর সুস্থ হত। ভাইরাস সংক্রমণের ফলে এই রোগ হয়। সেই সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আক্রান্ত শিশুকে প্রচুর পরিমাণে খাবার খাওয়ানো প্রয়োজন।

ইসলামের আগমনের পর মানুষের মাঝে থাকা রোগ সম্পর্কে এসকল কুসংস্কারের প্রাচীর গুলি ভেঙে যায় এবং স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয় যে ঈশ্বর ব্যতীত কেউই ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না। তিনি ব্যতীত যা কিছু সম্মুখে রয়েছে, সকলেই সৃষ্টবস্তু এবং তাঁরই গোলাম বা দাস। ইসলামী বিপ্লবের পর মানব মেধা মননে যখন এরূপ চিন্তার সংযোজন হলো তারা বিভিন্ন প্রচলিত কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণ স্বাধীনভাবে চিন্তাভাবনা শুরু করে। আর এর পরই বিভিন্ন রোগ নিয়ে গবেষণা করা এবং তার চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কারের প্রচেষ্টা শুরু হয়।

যখন সমগ্র বিশ্বব্যাপী এরূপ মনস্তাত্ত্বিক বিপ্লবের প্রতিষ্ঠা হল, তারপরেই বসন্ত রোগ ও তার চিকিৎসাকে গবেষণার বিষয়বস্তুতে রূপান্তর করা সম্ভব হল। কেবলমাত্র তখনই আবু বকর (রাযি:) এবং এডওয়ার্ড জেনারের মতো মানুষ এগিয়ে এলেন এবং প্রতিষেধক আবিষ্কার করে সমগ্র বিশ্বকে এই রোগের কবল থেকে মুক্ত করলেন।

মূর্তিপূজার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত কুসংস্কার গুলি প্রকৃতপক্ষে রোগ নিরাময় আবিষ্কার করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। ইসলাম আসার পর এই প্রতিবন্ধকতা গুলি ইতিহাসের পাতা থেকে সর্বপ্রথম বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ভাষা বিজ্ঞান

ভাষা বিষয়েও কুসংস্কার বা অন্ধকারাচ্ছন্ন বিশ্বাস হৃদয়ে লালন করার জন্য হাজার বছরের অধিক সময় ধরে ভাষা বিজ্ঞান কঠিন স্থবিরতার মধ্যে পড়ে ছিলো। প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ ডা.আর্নেস্ট জেলনার (Dr. Ernest Gellner) খুব যথার্থই

লিখেছেন, 'ভাষা তাত্ত্বিক দর্শনের অভ্যন্তরে বিপরীত রীতির দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয় যা প্রকৃত বা বাস্তব চিন্তা চেতনাকে ব্যাধি হিসেবে বিবেচনা করে এবং মৃত চিন্তাভাবনাকে তার নিকট সুস্বাস্থ্যের দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।'

প্রাচীনকালে ভারতীয় ব্রহ্মা লিপির (The Indian Concept of Braham Lipi) ধারণা অনুসারে বিশ্বাস করা হত যে, লেখ্যবিদ্য বা লেখা ঈশ্বরের দান। শব্দ গঠন এবং বিন্যাসও ঈশ্বর প্রদত্ত; আর এই জন্য তা অতি উচ্চ সম্মানের (Highest Veneration) যোগ্য হিসাবে গণ্য করা হতো। জন স্টেভেন্স (John Stevens) এর লিখিত Sacred Calligraphy of the East নামক গ্রন্থে তিনি তাঁর গবেষণাকে উপস্থাপন করতে গিয়ে লিখেছেন যে, পবিত্র লিপির বা লেখার ধারণাটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রচলিত ছিল। গবেষকদের মাঝে এর উৎস এবং উৎপত্তি স্থান সম্পর্কে মত পার্থক্য রয়েছে। তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, মিশর, বা চীন, বা ভারত, বা অন্য কোন স্থানে এই ধারণা উৎপত্তি লাভ করে। তবে এ বিষয়ে একটি সর্বজনীন ধারণা ছিল যে, লেখা ঈশ্বরের দান। আর তা সত্তাগত ভাবে অতি পবিত্র এবং লিপি বা রচনা দেবতাদের ভাষা বা কথা।

এটা ঐতিহাসিক ভাবে সত্য যে, মানুষের ভাষা বা কথন হাজার হাজার বছর পর্যন্ত কুসংস্কারের চাদরে আবৃত ছিল। ধারণা করা হতো যে, নিদিষ্ট কিছু ভাষার ঐশ্বরিক ভিত্তি রয়েছে, আর সেই সকল ভাষায় যারা কথা বলত তারা বিশেষ মর্যাদা ভোগ করতো। উদাহরণস্বরূপ - গ্রিক ভাষা সম্পর্কে দীর্ঘ একটি সময় পর্যন্ত ধারণা করা হতো যে, এই ভাষা জগতের অন্যান্য ভাষা থেকে শ্রেষ্ঠ। কারন গ্রিক ভাষা হলো দেবতাদের ভাষা। গ্রিক ভাষার বিপরীতে অন্যান্য সকল ভাষা ছিল তাদের দৃষ্টিতে বর্বর (Barbarians)।

হিব্রু ভাষার ক্ষেত্রেও একই বিষয় পরিলক্ষিত হয়। ইহুদী ও খ্রিস্টান জগতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মনে করা হত যে হিব্রু ভাষা ঈশ্বরের নিজের ভাষা এবং এটিই পৃথিবীর প্রথম ভাষা। ওয়ান্ডারলি (Wonderly) এবং ইউজিন নিদা (Eugene Nida) ভাষার উপর খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের প্রভাবগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত

অধ্যায়ন ও বিশ্লেষণ করে বলেনঃ ভাষার অগ্রগতির পথে একাধিক প্রতিবন্ধকতার মাঝে অন্যতম প্রধান একটি প্রতিবন্ধকতা হলো, প্রাথমিক যুগের খ্রিস্টানগণ তাদের নব জাগরণের যুগেও এই ধারণা পোষণ করতো যে, সমগ্র ভাষা হিব্রু ভাষা থেকে উদ্ভাবিত হয়েছে।

ঐশ্বরিক ভাষার (Divine Language) মতাদর্শটি পূর্ণাঙ্গরূপে কুসংস্কার থেকে উদ্ভাবিত, যার সাথে বাস্তবতার লেশ মাত্র সম্পর্ক ছিল না। যখনই কোন ভাষাকে ঐশ্বরিক ভাষা হিসাবে ধারণা করা হয় তখন তা পবিত্র ভাষা হিসাবে জনসাধারণের নিকট সম্ভ্রম দাবী করে। তখন তা আর গবেষণার বিষয় হতে পারে না। তখন তাকে স্বল্প তো নয়ই কিঞ্চিৎ সংস্কার করে আধুনিকীকরন করা মহা পাপ ও অমার্জনীয় অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অতএব উক্ত ভাষাকে যাচাই বাছাই করা, সেই ভাষার অগ্রগতির জন্য নব নব পদ্ধতি অবলম্বন করা, সব কিছুই পরিত্যাজ্য বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়। কারন তা পবিত্রতার অখন্ডতা বিনষ্টকারী কার্য হিসেবে প্রতীয়মান হয়। আর এরকম গবেষণা ও প্রচেষ্টা গুলি উক্ত মতাদর্শ লালনকারীদের নিকট অশুভ ও দুঃসাহসিকতা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এই প্রকার উন্নয়নের অবরুদ্ধতা কেবলমাত্র প্রাচীন ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এই কুসংস্কারাবব্ধ চিন্তনের ধারা বৌদ্ধিক বিকাশের সকল বিভাগকে সংক্রমিত করেছিল। ইতিহাস সাক্ষী, সভ্যতার ধারাপথে প্রথমবার যে বিপ্লব এই সকল প্রতিবন্ধকতার জাল ছিন্ন করে, তা ছিল একেশ্বরবাদী চেতনার বিপ্লব। এই বিপ্লব সর্বপ্রথম আরবে উদ্ভুত হয়ে ক্রমান্বয়ে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তখন থেকেই মানব জাতি কুসংস্কারের যুগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে বাস্তবতার যুগে প্রবেশ করে।

পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনে যখন ঘোষণা করা হলো, এক ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন ঈশ্বর নেই, সেই মুহুর্ত থেকে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সূচনা হলো। মানবজাতি অলীক চিন্তাভাবনার আবেষ্টন থেকে মুক্তি লাভ করে, সকল বস্তু সম্পর্কে নতুন করে চিন্তাভাবনা করতে শুরু করে। তাদের এই চিন্তাধারার পরিসীমা বৃদ্ধি পেতে থাকে, এমনকি তা বর্তমান বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের যুগে এসে পৌঁছায়।

এক ঈশ্বরকে উপাস্য মান্য করা এবং অন্যান্য সকল বস্তুকে উপাস্যের সম্মান প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করার অর্থ হলো, ঈশ্বর ব্যতীত সকল কিছুকেই পবিত্রতা বা ঐশ্বরিকতার স্থান থেকে অপসারিত করা এবং বুঝতে পারা যে ঈশ্বর ব্যতীত কোন কিছুই পবিত্র (Holy) নয়।

মূলত কোন বস্তুকে পবিত্রতার স্থানে বসানোর অর্থ হলো, তাকে নিয়ে গবেষণা ও বিশ্লেষণের পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা। আর ঐ সকল বস্তুকে অনৈশ্বরিক (Hollyness) ঘোষণা করার অর্থ হল তাকে গবেষণা ও পর্যালেচনার বস্তুতে রূপান্তর করা। আর এটাই ইসলামের কৃতিত্ব, যে জন্য তাকে আধুনিক যুগের রূপকার হিসেবে গণ্য করা হয়।

সংখ্যা বিদ্যা

সংখ্যার বর্তমান পদ্ধতিটি ভারতবর্ষে উদ্ভাবিত হয়েছিল। তথাপি সেই যুগে চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী প্রতিটি সাধারণ বস্তুকে পবিত্র বা ঐশ্বরিক বলে মান্য করা হতো। নব আবিষ্কৃত বিষয়গুলিকে সন্দেহের নজরে দেখা হতো। আর এজন্য সংখ্যা শাস্ত্র তখনও ভারতবর্ষে প্রচলিত হতে পারেনি। তা শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন কিছু গ্রন্থের অভ্যন্তরে আবদ্ধ হয়ে রয়ে গিয়েছিল। তারা এসকল নব উদ্ভাবনকে গ্রহণ করেনি।

নব প্রতিষ্ঠিত বাগদাদে নতুন আবিষ্কারগুলিকে কদর করা হয় - এই সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে একজন ভারতীয় পর্যটক ১৫৪ হিজরি বা ৭৭১ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে গমন করেন। সেই সময় বাগদাদের মসনদে আব্বাসীয় খলিফা 'আল মানসূর' অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই ভারতীয় পণ্ডিত বাগদাদে দুটি গ্রন্থ উপস্থাপন করেন। তার একটি 'সিদ্ধান্ত' (Siddhanta) নামক জ্যোতির্বিদ্যার উপর লিখিত গ্রন্থ। আরবগণ এই গ্রন্থটিকে সিন্দ-হিন্দ (Sind-Hind) নামে অভিহিত করে থাকে। আর দ্বিতীয় গ্রন্থটি ছিল, গণিত বিষয়ক। খলিফা আল মানসূরের নির্দেশে মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম আল ফিজারী (Muhammad Ibn Ibrahim Al Fizari) ৭৯৬

থেকে ৮০৬ সালের মধ্যে উক্ত গ্রন্থদ্বয় আবরীতে অনুবাদ সম্পন্ন করেন। বিখ্যাত আরবীয় গণিতজ্ঞ আল খাওয়ারিমী (৭৮০-৮৫০) ঐ আরবী অনুবাদ অধ্যায়ন করেন যার মধ্যে শুন্য (০) সংখ্যাটির প্রয়োগ ছিল। তিনি লক্ষ্য করেন, ভারতীয় নয়টি সংখ্যা ১ - ৯ এবং শুন্য '০' প্রয়োগ করে যেকোনো সংখ্যা লেখা সম্ভব। ভারতীয় সংখ্যাগুলিকে তিনি খুব প্রশংসা করেন এবং সাধারণভাবে এগুলি গ্রহণ করার জন্য পরামর্শ দেন।

ফিলিপ কে হিট্টি (Philip K. Hitti) লেখেন: নবম শতাব্দীর প্রথম অর্ধে আল-খাওয়ারিজমি তার লিখিত গ্রন্থগুলিতে অক্ষরের পরিবর্তে শুন্য '০' সহ অন্যান্য সংখ্যার ব্যবহারের কথা বলেন। এই সংখ্যাগুলিকে তিনি হিন্দি বলতেন, এবং এর দ্বারা সংখ্যাগুলির ভারতীয় চরিত্রকেই তিনি বোঝাতে চাইতেন। হিন্দু গণনা পদ্ধতির উপর তার রচনাবলী বাথ এর অধিবাসী অ্যাডেলাড দ্বাদশ শতকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। সেই ল্যাটিন অনুবাদ 'দ্য ন্যমেরা ইন্ডিগো' অক্ষত থাকলেও মূল আরবী গ্রন্থটি হারিয়ে গেছে। [৫৬]

ইউরোপে প্রাচীন রোমান যুগের ব্যবহৃত রোমান গণনাশাস্ত্র প্রচলিত ছিল। এই পদ্ধতিতে অক্ষরের সাহায্যে সংখ্যা লেখা হতো। গ্রিক ও কিছু প্রাচীন সভ্যতাগুলি এবং পরবর্তীকালে রোমানগণ এই পদ্ধতি অনুসরণ করতো। তারা সাতটি অক্ষর যথা M. D. C. L. X. V. I বিভিন্ন সমবায়ে ব্যবহার করতো। উদাহরণস্বরূপ - যদি তারা ৮৮ সংখ্যাটি লিখতে চাইতো তাহলে তারা এভাবে লিখতো, LXXXVIII আর এজন্য তাদের হিসাব নিকাশের কাজটি অতি কঠিন ছিল। এত কঠিন হওয়া সত্ত্বে ইউরোপীয়রা একে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল, তার কারণ তারা এই রোমান পদ্ধতিটিকে পবিত্র বা ঐশ্বরিক পদ্ধতি হিসাবে ধারণা করতো। তারা একে দেবতাদের উপহার হিসেবে জানতো। এজন্যই তারা একে পরিবর্তন বা সংশোধন করার কথা ভাবতে পারেনি। অনৈশ্বরিক বস্তুকে ঐশ্বরিক মনে করার ফলস্বরূপ তারা কয়েক শত বৎসর বিজ্ঞান ও গণিতের ক্ষেত্রে কোন প্রকার উন্নতি বিধান করতে পারে নি। ইসলামী বিপ্লব এসে সমগ্র বিশ্বের সামনে প্রথমবার এসকল অঙ্কশাস্ত্র ও বর্ণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঐশ্বরিকতার আবেগ দূর করে দেয় এবং ইউরোপে বৈজ্ঞানিক প্রগতির দরজা উন্মুক্ত করে দেয়।

লিওনার্দো ফিবার্কচি (Leonardo Fibaracci) বা লিওনার্দো অফ পিসা (Leonardo of Pisa) ছিলেন মধ্যযুগের একজন বিশিষ্ট গণিতবিদ। তিনি গণিত শাস্ত্রের সঙ্গে হিন্দু-আরবীয় সংখ্যা ও তাদের বিন্যাসরীতি প্রবর্তন করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর জীবনের প্রথম দিক সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। খুব সম্ভবত: তিনি ইটালির পিসা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। লিওনার্দোর ছেলেবেলায় তাঁর পিতা, পিসার একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, গুগলিয়েলমো, উত্তর আফ্রিকার বন্দর বুগিয়াতে (বর্তমানে আলজেরিয়ার অন্তর্গত বেজারা) অবস্থিত পিসার ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর তৎকালীন বাণিজ্য দূত বা চিফ ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। খুব শীঘ্র লিওনার্দো তার পিতার সাথে যোগদান করেন। তাঁর পিতা তাকে হিসাব ও গণনা বিষয়ক বিদ্যা শেখানোর জন্য একজন আরবীয় শিক্ষক নিয়োগ করেন। সেখানে তিনি ভারতীয় ৯ টি সংখ্যার প্রয়োগ শেখেন। বিদ্যা অর্জন সমাপ্ত হলে লিওনার্দো মিশর, সিরিয়া, সিসিলি সহ অন্যান্য মুসলিম সভ্যতার শহর গুলিতে সফর করেন। সেখানে হিসাব সংক্রান্ত বিভিন্ন সংখ্যাতত্ত্ব শিক্ষা লাভ করেন কিন্তু আরবীয় সংখ্যা সূচকের মতো সেগুলি তার কাছে সন্তোষজনক বলে মনে হয় নি।

আরবী গণনা সম্পর্কে পূর্ণরূপে বুৎপত্তি লাভ করে নিজেই এই বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন যার নাম 'লাইবার আবাসি'। সেই সময়ের নবম শতকের আরব গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ অ্যাল-খাওয়ারিজমীর অনুবাদ গ্রন্থ পাঠ করে খুব নগণ্য সংখ্যক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ আরবী সংখ্যা সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। লিওনার্দো তাঁর নিরীক্ষণ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে বলেন, "নয়টি আরবী সংখ্যা - ৯,৮,৭,৬,৫,৪,৩,২,১. গুলির পর শুধুমাত্র একটি শূন্য (০) সংযোগ করে যেকোনো সংখ্যা লেখা সম্ভব। "গ্রন্থের প্রথম সাতটি অধ্যায়ে গাণিতিক প্রতীক, সংখ্যার একক, দশক, শতক ইত্যাদি স্থান ক্রমের ব্যাখ্যা এবং পাটিগণিতের সমস্যা সমাধানে সংখ্যাগুলির প্রতিপাদন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে মুনাফা সীমা নির্ধারণ, বাণিজ্যিক বিনিময়, মুদ্রা বিনিময়, ওজনের এককের রূপান্তর, যৌথ কারবারি হিসাব এবং সুদ নির্ণয় করা সহজতর হয়েছিল।

'লাইবার আবাসি' এত বেশি পরিমাণে অনুলিপিকরণ ও অনুকরণ হতে থাকে, যে বিষয়টি বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত রোমান সম্রাট

ফ্রেডারিক-II এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লিওনার্দোর সুনাম এতটাই বৃদ্ধি পায় যে ১২২০ খ্রিস্টাব্দে রোমান সম্রাট তাকে পিসাতে তাঁর দরবারে আমন্ত্রণ জানান। সেখানে গিয়ে তিনি সম্রাটের সম্মুখে একের পর এক নানা গাণিতিক সমস্যা উপস্থাপন করেন যার মধ্যে তিনটি তিনি তার বইয়ে লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং প্রথম দুটি ছিল আরবীয় রীতির।

উইলফ্রিড ব্লান্ট (Wilfrid Blunt) লিখেছেন, কল্পনা করুন, তার কাছে ইসলামের জোয়ার যদি না আসতো, তাহলে কি হতো? রোমানদের আনাড়ি গণনা পদ্ধতি পশ্চিমে বিজ্ঞানের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রাকে যতটা বাধাগ্রস্থ করেছিল আর কোন কিছু ততটা বাধাগ্রস্থ করে নি। আরবী গণনা পদ্ধতি যা খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর দিকে ভারত থেকে বাগদাদে পৌঁছায়, তা যদি আরও দ্রুততার সহিত ইউরোপে পৌঁছাতো এবং তাদের দ্বারা সামগ্রিকভাবে গৃহীত হতো, তাহলে আমরা যে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিকে ইতালির নব জাগরণের সাথে সম্পৃক্ত করি, তা খুব সম্ভবত আরও কয়েক শতাব্দী পূর্বেই অর্জন করা যেত।

একটি উপমা

যারা শূন্য উদ্ভবের ধারণাটি ভারতের সাথে সম্পৃক্ত করতে আগ্রহী তাদের জন্য চিলড্রেন বুক ট্রাস্ট, নয়াদিল্লি, ইংরেজি ভাষায় 'দ্যা স্টোরি অফ জিরো' বা শূন্যের গল্প নামে ২২ পাতার একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে, যা শিশুদের সহ বড়দের পড়ার উপযোগী করে লেখা হয়েছিল। বইটির লেখকের নাম, দিলিপ এম.সালওয়াই (Dilip M. Salwai)। বইটিতে বলা হয়েছে যে, শূন্যের ধারণাটির উদ্ভব ভারতে হয়েছিল। তারপূর্বে বড় সংখ্যাগুলিকে বলা ও লেখার জন্য সহজ কোন পদ্ধতি ছিল না। পদ্ধতি মোতাবেক কিছু বিশেষ গণনার জন্য বেশ কিছু শব্দ নির্ধারিত ছিল। উদাহরণস্বরূপ, ১০০০ কে সহস্র (Sahasara), ১০,০০০ কে অযুত (Aayota), ১,০০,০০০ কে লক্ষ (Laksha) এবং ১,০০,০০,০০০ কে কোটি (Koti) ইত্যাদি বলা হত। শূন্যের আবিষ্কার হিসাব বিজ্ঞানে এক নিদারুণ বিপ্লবের জন্ম দেয়। এখন বড় বড় গণনাগুলিকে প্রকাশ করা অতি সহজ হয়ে গিয়েছে।

ব্রহ্মা গুপ্তা (Brahma Gupta; ৫৯৮-৬৬০) ভারতের মূলতান শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনিই প্রথম বার শূন্যের পদ্ধতিটি নির্ধারণ করার চেষ্টা করেন। তাঁর অনুসৃত পদ্ধতিতেও বেশ কিছু ত্রুটি ছিল। তারপর ভাস্কর (Bhaskar; ১১১৪-১১৮৫) যিনি বিজাপুরে (Bijapur) জন্মগ্রহণ করেন, সংস্কৃত ভাষায় 'লাইলাওয়াতি' (Lailawati) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। সেই গ্রন্থে তিনি শূন্যের মূলনীতিকে অধিক সহজ করে বর্ণনা করেন।

আর.কে.মূর্তী (R.K.Murthi) ঐ 'লাইলাওয়াতি' গ্রন্থের পর্যালোচনা করে লিখেছেন, এই বিষয়টি আমাদের জাতিসত্তার গৌরবময় অনুভুতিকে বৃদ্ধি করে যে, শূন্যের দৃষ্টিভঙ্গি ভারতে উদ্ভাবিত।[৫৮]

লাইলাওয়াতির লেখক তাঁর লিখিত পুস্তকটির দ্বারা তাঁর পাঠকদের বলতে চেয়েছেন যে, ভারতীয় গণনা পদ্ধতিটি প্রথমে স্পেনে প্রবেশ করে, অতঃপর তা ইতালি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড এবং জার্মানে পৌঁছায়। ভারতীয় গণনাকে পশ্চিমা দেশগুলি পূর্ণরূপে গ্রহন করে। এরফলে গণিত এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্লবের এক জোয়ারের সূচনা হয়।[৫৯]

এটি সঠিক যে, শূন্যের ধারণাটি প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতেই জন্ম নেয়। তবে এটা সঠিক নয় যে, তা ভারত থেকে সরাসরি পশ্চিমে পৌঁছায়। এই পদ্ধতিটি আরবীয়দের মাধ্যমে পশ্চিমে পৌঁছেছিল। আর এই কারনেই পশ্চিমাগণ এটিকে ভারতীয় গণনা রীতি বলার বদলে আরবী গণনা রীতি বলে থাকেন। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা (১৯৮৪) তে এই একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বলা হয়েছে - আরবী গণনা, অর্থাৎ ০-১-২-৩-৪-৫-৬-৭-৮-৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি ভারতেই উদ্ভব হয়েছিল কিন্তু তা পশ্চিমা জগতে আরবীয়দের মাধ্যমে প্রবেশ করেছে।[৬০]

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা অন্য স্থানে ব্যক্ত করেছে, এই গণনা পদ্ধতি খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীতে আরব গণিতবিদ আল খাওয়ারিজমীর লেখনীর দ্বারা ইউরোপের বিজ্ঞানীদের নিকট পৌঁছায়। আল খাওয়ারিজমী ভারতীয় গণনার

মূলনীতি আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর তাঁর লেখা আরবী গ্রন্থটি ল্যাটিন ভাষায় অনুদিত হয়ে ইউরোপে পৌঁছায়।[৬১]

বার্ট্রান্ড রাসেল (Bertrand Russell) লিখেছেন, মুহাম্মদ আল মুসা আল খাওয়ারিজমী গণিত এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত লেখা সংস্কৃত গ্রন্থগুলির আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। ৮৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি একটি বই প্রকাশ করেন যা খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে আরবি থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয়। ল্যাটিন অনুবাদটির নাম, 'আলগোরিদম দে নুমেরো ইন্দ্রম'। এটিই সেই বই, যার দ্বারা পশ্চিমা জগৎ 'আরবীগণনা' পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারে। যদিও বাস্তবতার খাতিরে তাকে 'ভারতীয় গণনা' বলাই যুক্তিযুক্ত। আল খাওয়ারিজমী বীজগণিত (Algebra) বিষয়ক একটি বই রচনা করেছিলেন, যা ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত পশ্চিমা দেশগুলির পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহৃত হতো।[৬২]

শূন্যের ধারণা যদিও ভারতে উদ্ভুত হয়েছিল, কিন্তু বেশ কিছু শতক পর্যন্ত ভারতেই তার গ্রহণ যোগ্যতা ছিল না। ভারতে তার গ্রহণ যোগ্যতা তখনই বৃদ্ধি পায় যখন প্রথম আরবীয়গণ তারপর তাদের থেকে ইউরোপীয়গণ তা গ্রহণ করে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় বলা আছে, খুব সম্ভবত হিন্দুদের দ্বারা উদ্ভাবিত শূন্য সংখ্যাটি গণিতের ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। হিন্দু সাহিত্য সমূহ প্রমাণ করে যে, শূন্যের বিষয়টি সম্ভবত খ্রিস্টের জন্মের পূর্বেই জানা ছিল। তবে নবম শতাব্দীর পূর্বে এ জাতীয় চিহ্নযুক্ত কোন শিলালিপির অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি।[৬৩]

এই কথাটি সঠিক যে, শুন্যের ধারণা সর্ব প্রথম ভারতীয়দের মনে উদয় হয়েছিল। কিন্তু সেই সময় ভারতবর্ষে পূর্ণরূপে বহুশ্বরবাদ এবং কুসংস্কারের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রতিটি বিষয় ছিল রহস্যাবৃত এবং নব উদ্ভাবিত বিষয়কে তারা খুবই ঘৃণ্য নজরে দেখতো। আর সেই জন্যই প্রাচীন ভারতে শূন্যের ধারনাটি মৌলিকগত ভাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। বিচ্ছিন্ন একটি উদ্ভাবিত বিষয় হিসেবে এর গুরুত্বকে খর্ব করা হয়েছিল। ফলে এটা সর্বসম্মত

ভাবে গ্রহণযোগ্যতার পর্যায়ে পৌঁছাতে সক্ষম হয়নি। ভারতের মাটিতে উৎপাদিত বীজ যা অবহেলিত হয়ে পড়েছিল তা মুসলিম বাগদাদের উর্বর মাটিতে এসে যখন পড়ে তখন সেখানে একটি চারা গাছের জন্ম হয়। উক্ত চারা গাছটি বড় হতে হতে এতটাই প্রশস্থ হয়ে যায় যে, তা মুসলিম স্পেন হয়ে সমগ্র ইউরোপ বিস্তার লাভ করে। যদি ইসলাম সর্বপ্রথম বহুশ্বরবাদ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মতাদর্শগুলি নির্মূল না করতো, তাহলে অন্যান্য নব উদ্ভাবিত জিনিসের মত শূন্যের ধারণাটি সর্বজনীন ভাবে স্বীকৃতি অর্জন করতে পারতো না।

কৃষি ও সেচ সম্প্রসারণ

প্রাচীণ যুগে প্রাকৃতিক যে সকল দৃশ্যমান বস্তুগুলিকে ঐশ্বরিক গুণাগুণ সম্পন্ন মনে করা হতো, তার মধ্যে অন্যতম একটি হল নদী। নদ-নদীর বিষয়ে প্রাচীন মানুষদের ধারণা ছিল যে, নদীর অভ্যন্তরে রহস্যময় ঐশ্বরিক আত্মার বাস রয়েছে। ঐ সকল রহস্যময় আত্মাই এসকল নদ-নদীকে পরিচালনা করে এবং সেই সাথে তারা নদী গুলিকে মানুষের জন্য কল্যাণ এবং অকল্যাণের মাধ্যম বানায়।[৬৪]

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের গ্রীক ভাষ্যকার আইশিনিস বা আইশাইনদের মতে প্রাচীন গ্রিসের স্কামেন্দ্রোস (Skamandros) নদীর ব্যাপারে স্থানীয়ওদের মাঝে এই বিশ্বাস ছিল যে, এই নদী প্রজনন এবং উর্বরতা প্রদানের ক্ষমতা রাখে। দেশের কুমারী মেয়েরা বিবাহের পূর্বে ঐ পবিত্র নদীতে স্নান করে নদীকে উদ্দেশ্য করে বলতো, ' স্কামেন্দ্রোস ! আমার কুমারিত্বকে তুমি গ্রহন করো।' শুক্রাণু বা পুরুষ প্রজননের বিকল্প হিসাবে নদীর জলের ব্যবহার সংক্রান্ত সাধারন বিশ্বাসের অসংখ্য নমুনা পাওয়া যায়।[৬৫]

এভাবে নদ-নদীকে পবিত্র বা ঐশ্বরিক জ্ঞান করার দরুন (এরূপ বিশ্বাস আজও বর্তমান) মানুষ নদ-নদীকে পূজা করতে শুরু করে এবং তারা সেই সকল নদীর নামে উৎসর্গ করা শুরু করে। মূলত এরূপ মানসিকতাই তাদেরকে নদীকে নিয়ে বিশ্লেষণের মানসিকতা তৈরি হতে দেয়নি। মানুষ নদীকে ঐশ্বরিক

দেবতার রূপে দেখতো, সেই সকল নদীকে সাধারণ প্রকৃতিদত্ত বিষয় জ্ঞান করতো না, যা সহজ পদ্ধতিতে মানুষের কাজে ব্যবহার করা যায়। আর এজন্যই প্রাচীন যুগে নদীর জলকে কৃষি কাজে ব্যবহার করার রীতি খুব অল্পই পরিলক্ষিত হয়। সেচ সম্প্রসারণের ইতিহাসটি আশ্চর্যজনক ভাবে মানব ইতিহাসের আধুনিক যুগের সাথেই সংশ্লিষ্ট।

ইসলামের মাধ্যমে যখন একেশ্বরবাদী বিপ্লব আসে এবং মানুষের নিকট ব্যক্ত করা হয় যে, এই নদী নালা অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মতই একটি সৃষ্টবস্তু মাত্র এবং তা স্রষ্টা নয়; তা সাধারণ একটি দাস, প্রভু নয়; তারপরেই মানুষ বৃহৎ পরিসরে নদীগুলিকে নিজেদের উপকারার্থে ব্যবহার করার কথা ভাবতে থাকে। আর এজন্যই আমরা ইতিহাসে পড়েছি যে, স্পেনের মুসলিমগণ যত বৃহৎ পরিসরে জল সিঞ্চনের কাজ করেছিল, তার দ্বিতীয় কোন নজির এর পূর্বে ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

স্পেনের মুসলিমগণ কৃষিতে এতটা বিকাশ ও উন্নয়ন ঘটিয়েছিল যে, তা একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান-কলায় পরিনত হয়েছিল। তারা প্রথমে বৃক্ষ সম্পর্কে চর্চা শুরু করে এবং সেই সাথে মাটির বিশেষত্ব, গুন এবং বৈশিষ্ট্য গুলি নিয়ে গবেষণা চালায়। স্পেনের লক্ষ মাইল বিস্তীর্ণ অকর্ষিত বন্ধ্যা ভুমি ফলের বাগিচা এবং সবুজ ভূমিতে রূপান্তরিত হয়। এটা প্রকৃতপক্ষে একটি কার্যকরী সবুজ বিপ্লব ছিল।

ফিলিপ কে হিট্টি লিখেছেনঃ তারা খাল খনন করেছিল, আঙুর চাষ শুরু করেছিল এবং ধান, খুবানি, পীচফল, ডালিম, কমলালেবু, আখ, তুলা ও জাফরান চাষ শুরু করেছিল। এই উপদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের সমভূমি এবং সেখানকার আবহাওয়া অনুকূল ছিল, যার ফলে ঐ অঞ্চল নানান গ্রামীণ ও নাগরিক জীবনের কার্যাবলীর কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল। এখানকার কৃষক শ্রেণী ভাগচাষ পদ্ধতিতে গম ও অন্যান্য খাদ্যশস্য এবং জলপাই ও অন্যান্য বিভিন্ন ফল চাষ করত। মুসলিম শাসিত স্পেনের অন্যতম গৌরব ছিল কৃষির উন্নয়ন এবং

আরবদের কাছ থেকে স্পেন যে সমস্ত স্থায়ী উপকার পেয়েছিল এটি তার অন্যতম। কারণ স্পেনের বাগানগুলি আজও একটি মুরিশ (Moorish) ছাপ বহন করে চলেছে। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বাগান গুলির মধ্যে অন্যতম হলো 'জেনারেলাইফ' (আল-জানাত আল-আরিফ, অর্থ পরিদর্শকের স্বর্গ), ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকের একটি নাস্রিদ স্মৃতি সৌধ। এই উদ্যান বাটিকাটি ছিল আলহাম্বরার বাইরের ভবনগুলির মধ্যে একটি। এই বাগানটি তার বিস্তৃত ছায়া, জলপ্রপাত এবং মৃদু মন্দ বাতাসের জন্য প্রবাদ তুল্য ছিল, একটি অ্যাম্ফিথিয়েটারের আকারে ছাদ তৈরী করা হয়েছিল এবং জলস্রোত দ্বারা বাগানটি বিধৌত ছিল আর এই জলস্রোতগুলি অসংখ্য জলপ্রপাত তৈরি করার পর ফুল ও গুল্ম গাছের আড়ালে হারিয়ে যেত। এখন সেখানে অল্প কয়েকটি বিশাল সরলবর্গীয় বৃক্ষ এবং সুন্দর সুগন্ধযুক্ত চিরহরিৎ গুল্ম ছড়িয়ে আছে। [৬৬]

ফরাসি লেখক চার্লস সেনোবেস লিখেছেন যে স্প্যানিশ আরবরা খাল খনন করে সেচ শুরু করেছিল। তারা বড় বড় কূপ ও খননকার্য করেছিল। যারা জলের নতুন উৎস আবিষ্কার করেছিলেন তাদেরকে বড় আকারের পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। স্পেনে তারা বিস্তৃত খাল খনন করেছিল, এবং তারপরে সেগুলি নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত করেছিল, যার ফলস্বরূপ ভ্যালেন্সিয়ার (Valencia) মত বন্ধ্যা ভুমিও সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে। তারা সেচকার্য তদারকের জন্য একটি স্থায়ী বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছিল, যা সব ধরণের প্রাসঙ্গিক তথ্য সরবরাহ করত।

বার্ট্রান্ড রাসেল মুসলিম শাসিত স্পেনের বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন, যে আরব অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল তাদের কৃষিকাজ। বিশেষত, তাদের অত্যন্ত দক্ষ সেচ ব্যবস্থা, যা তারা তাদের মরুজীবনের তীব্র জল সংকটের অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছিল। আরব সেচ ব্যবস্থা থেকে স্পেনের কৃষিকাজ এখনও লাভবান হচ্ছে।[৬৭]

এটা বাস্তব যে, স্পেনে যে সকল মুসলিমরা গমন করেছিল, সেখানে গিয়ে তারা এক নব কৃষি বিপ্লব ঘটিয়েছিল। সেখানে গিয়ে তারা কৃষি উপযোগী ক্ষেত এবং বাগানগুলিতে জল সিঞ্চনের জন্য এমন সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল, যার

নজির এর পূর্বের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। কিন্তু খুব আশ্চর্যের বিষয় হল, বার্ট্রান্ড রাসেল তাদের সেই সকল বিষয়কে তাদের মরু জীবনের জল শূন্যতার অভিজ্ঞতা বলে বর্ণনা করেছেন। এমন ব্যাখ্যা মূলত অর্থহীন। বাস্তবিকভাবে, তাদের সেই সকল কার্যক্রমের অন্তর্নিহিত কারন হল, একেশ্বরবাদী বিপ্লব, যা আরবদের মানসিকতার আমূল পরিবর্তন ঘঠিয়েছিল। এর পূর্বে, মানুষ নদ-নদী,ঝর্ণা, সমুদ্রকে দেবতা মান্য করতো। তারা সেগুলিকে সম্ভ্রমের বস্তু বলে মনে করতো, সেগুলিকে তারা ব্যবহার ও বিশ্লেষণের বস্তু মনে করতো না। আরবীয়গণ তাদের পরিবর্তিত মানসিকতার দ্বারা উক্ত জিনিসগুলিকে ঈশ্বরের অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে অন্যতম একটি সৃষ্টি বলে মনে করতো। তারা ঐ সকল জিনিসকে কিভাবে ব্যবহার করা যায়, সেই সম্পর্কেই ভাবনা চিন্তা করতো। আর এই মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব আরবদেরকে এমন যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলে, যার থেকে তারা কৃষি এবং সেচ প্রক্রিয়াকে এমন এক বিষয় হিসাবে উপস্থাপন করে যা ইতিহাসে বিরল।

মরুজীবনে যেখানে জলের স্বল্পতা ছিল, সেখানে কিভাবে সেচ সম্প্রসারণ সম্পর্কে শেখা যাবে? মূলত বার্ট্রান্ড রাসেল এর, আরব মুসলিমদের সেই মানসিক বিপ্লব সম্পর্কে সঠিক কোন ধারণা ছিলো না। সেজন্যই তিনি একদম অমূলক ভাবে তাদের কার্যক্রমকে মরুজীবনের অভিজ্ঞতার সাথে যুক্ত করেছেন।

সেচ বিজ্ঞান সম্পর্কে তাদের অগ্রগতি, তাদের মানসিক বিপ্লবের সাথে সম্পৃক্ত যা একেশ্বরবাদের দ্বারা তাদের অভ্যন্তরে বিকশিত হয়। এটা তাদের মরুভূমিতে অতিবাহিত জীবন থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা ছিল না।

ইতিহাস বিজ্ঞান

ইতিহাস অধ্যায়নের একটি পদ্ধতি হলো, (Nation) রাষ্ট্রকে একক (Unit) স্বীকৃতি দিয়ে ইতিহাস অধ্যায়ন করা। তবে আর্নল্ড টয়োনবি (Arnold Toynbee) কিছুটা পরিবর্তন করে বলেছেন, ইতিহাস অধ্যায়নের সঠিক (Unit) এককটি অবশ্যই একটি সভ্যতা (Civilization) কেন্দ্রীক হতে হবে।[৬৮]

ইতিহাসের দুটি ধারণাই একটি সাধারণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত-

ইতিহাস কেবলমাত্র রাজা-বাদশা এবং উচ্চ পদাধিকারীদের কার্যকলাপের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকবে না,বরং তা যেকোনো রাজনৈতিক পরিমণ্ডল বা সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত সমগ্র মানব মন্ডলী ও তাদের কার্যকলাপকে সন্নিবিষ্ট করবে। বর্তমান যুগে ইতিহাসকে যদি 'মানব নামা' বলা হয়, তবে প্রাচীন যুগের ইতিহাসকে শুধুমাত্র 'শাহনামা বা বাদশাহ নামা' বলতে হয়। প্রাচীন ইতিহাসগুলি রাজা বাদশাহদের বিস্তারিত বিবরণ, তারা কিভাবে কখন কোথায় কোন রাজপ্রাসাদ বা রাজ্য দখল করেছিলেন তার বিবরণ সহ তার অধীনে থাকা সেনাপতি যে সকল আদেশ ও ফর্মান জারি করেছিল তার বিস্তারিত বর্ণনায় পরিপূর্ণ থাকতো। সেই সকল বর্ণনার কোন স্থানেই সাধারণ জনগণের কোন কৃতিত্ব মহিমান্বিত করে চিহ্নিত করা নেই। একমাত্র ইতিহাসের পাতায় উল্লেখ্য যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে সেই সৌভাগ্যবান মানুষটি বিবেচিত হতেন যার মাথায় রাজমুকুট এবং হাতে রাজদণ্ড থাকতো। প্রচীন ইতিহাস মানবতাকে (চূড়ান্ত ভাবে) হতাশ করেছে।

ইতিহাসকে 'শাহনামা বা বাদশাহ নামা' বানানোর এই মানসিকতা এতো অধিক পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, রাজা বাদশা নয় এমন মানুষের ঘটনা কোন মতেই বর্ণনার যোগ্যতা রাখে বলে মনে করা হতো না। কেবলমাত্র রাজা মহারাজাদের কিংবদন্তী গল্প ও কেচ্ছা-কাহিনীগুলো এমন ভাবে বর্ণনা করা হতো যে সেগুলো সত্য বলে প্রতীয়মান হতো। উদাহরণস্বরূপ - মিশরের উপকূলীয় শহর আলেকজান্দ্রিয়ার কথা বলা যায়, আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট ৩৩২ খ্রিস্টপূর্বে এই শহরের পত্তন করেছিলেন। এজন্য শহরটির নাম তাঁর নামের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে আলেকজান্দ্রিয়া রাখা হয়েছিল। আলেকজান্ডারের এই শহর পত্তন করার সঙ্গে সম্পর্কিত যেসব অবাস্তব ও অদ্ভুত কল্পকথা প্রচলিত আছে, সেগুলোর মাঝে একটি ঘটনা হলো - আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট যখন সমুদ্র তীরে ঐ শহরটি নির্মাণ করা শুরু করেন, তখন সমুদ্র তলদেশ থাকা সামুদ্রিক রাক্ষস গুলি তার কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা শুরু করে। বিষয়টি অবলোকন করে তিনি কাঠ এবং কাঁচ দিয়ে একটি মজবুত বাক্স নির্মান করান। বাক্সটি নির্মান সম্পন্ন হলে তিনি তার ভেতরে প্রবেশ করেন এবং সেই কাঁচের বাক্সটির মধ্যে

থেকে তিনি সাগরের তলদেশে নেমে যান। তিনি সমুদ্রতলে রাক্ষসদেরকে নিজ চোখে দেখেন। উপরে এসে তিনি ঠিক অনুরূপ ড্রাগন আকৃতির ধাতু-মূর্তি নির্মাণ করান। সেই আকৃতির চিত্রকর্ম বা মূর্তিগুলি তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার মূল ভিত্তিপ্রস্তরের নিচে স্থাপন করেন। অতঃপর সমুদ্রতলদেশ থেকে যখন রাক্ষসগুলি বের হয়ে শহরে ঢোকে, তখন দেখতে পায় যে, তাদের মত একাধিক রাক্ষসকে হত্যা করে মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছে। তখন রাক্ষসগুলি মারাত্মকভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে চিরদিনের জন্য সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এই রূপকথার গল্পটির মাধ্যমে প্রাক ইসলামী যুগে সমগ্র বিশ্বের ধর্মবিশ্বাস কেমন পর্যায়ের ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়।

মানব ইতিহাসে পয়গম্বরদের জীবন ও কার্যকলাপকে সর্বাধিক পরিমানে উপেক্ষা করা হয়েছে। যদি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে ইতিহাস লেখা হয় আর তাতে মহাত্মা গান্ধীর নাম না থাকে, যদি রুশ কমিউনিস্টদের সম্পর্কে ইতিহাস রচিত হয় এবং লেলিন সম্পর্কে কিছুই না লেখা হয়; তাহলে এরূপ ইতিহাস যে কোনো মানুষের নিকট বড়ই অদ্ভুত বলে প্রতীয়মান হবে। ঠিক এমনই এক অদ্ভুত ঘটনা হলো, মানব জাতির অতীত ইতিহাসের ঐ সকল ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গ যাদেরকে পয়গম্বর বলা হয়, তাদের জীবনকথা ইতিহাসের পাতায় না থাকা। ইতিহাসে শুধুমাত্র সর্বশেষ পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর বিষয়টিই ব্যতিক্রম। ইতিহাসে তাঁর নামটি সংযোজিত হওয়ার মূল কারণটি হলো, ইসলামীয় বিপ্লবের সূচনা করে তিনি সমাজের অগণতান্ত্রিক, বহুশ্বরবাদী এবং কুসংস্কারাবদ্ধ চরিত্রকে বদলে দিয়েছিলেন,যা এতদিন ধরে মানব ইতিহাস লেখনীর ক্ষেত্রে এক বৃহৎ শূন্য গহ্বর সৃষ্টি করেছিল। একথা শুনিশ্চিত ভাবে বলা যায়, ইসলামীয় বিপ্লব ইতিহাস রচনার ধারাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

আরবী ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬) হলেন প্রথম একমাত্র ঐতিহাসিক যিনি ইতিহাস রচনার ধরনই পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তিনি ইতিহাস রচনাকে নিছক রাজগল্প বা Kingology স্তর থেকে সরিয়ে এনে খাঁটি মানব ইতিহাসের স্তরে উন্নীত করেছেন। তারফলে শাহনামা বা বাদশাহনামা

(Kingology) সমাজ বিজ্ঞানে (Sociology) পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান যুগে সকলের নিকট পরিচিত সমাজ বিজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে ইবনে খালদুনেরই দেওয়া উপহার। ইবনে খালদুন নিজের সম্পর্কে লেখেন, তিনিই সমাজবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা। আর তাঁর দাবিটি নিয়ে বিতর্ক করার কোন সুযোগ নেই।

অনুরূপভাবে, রবার্ট ফ্লিন্ট (Robert Flint) খালদুনের কৃতিত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে বলেন তার সময়কালে তিনশত বৎসরের ও অধিক পরে ভিকোর (Vico) জন্মের পূর্ব পর্যন্ত কোনো দেশে কোনো কালে তার সমতুল্য কোনো তাত্বিক ইতিহাস রচয়িতা জন্মগ্রহণ করেন নি।[৬৯]

ইবনে খালদুনই ইউরোপকে আধুনিক ইতিহাসবিদ্যা উপহার দিয়েছেন। আর স্বয়ং ইবনে খালদুন যেখান থেকে এই বিদ্যা অর্জন করেছিলেন তা হলো ইসলাম। ইসলামী বিপ্লব ইবনে খালদুনকে জন্ম দিয়েছে এবং সেই ইবনে খালদুন নব এক ইতিহাস বিদ্যার জন্মদান করেছেন।

প্রফেসর হিট্টি লেখেন, ইবনে খালদুন তাঁর লেখা 'মুকদ্দমা' বইটির জন্য সুনাম অর্জন করেন। উক্ত গ্রন্থে তিনিই সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক বিকাশের একটি তত্ব উপস্থাপন করেছেন। এই তত্বে তিনি আবহাওয়া ও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রাকৃতিক ঘটনাবলি, সেই সাথে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শক্তিমত্তাকেও ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ করার উপর গুরুত্ব দেন। কোন মানুষ যদি জাতির অগ্রগতি ও অবক্ষয়ের নিয়ম রচনা করার চেষ্টা করেন,অবশ্যই তাকে ইবনে খালদুনের ইতিহাসের প্রকৃত সীমা ও চরিত্রের আবিষ্কারক বা অন্ততপক্ষে সমাজ বিজ্ঞানের প্রকৃত জনক বলে গণ্য করতে হবে যেরূপ তিনি নিজেই তাঁর মোকদ্দমাতে নিজের সম্বন্ধে এমনটি উল্লেখ করেছেন। কোন আরব রচয়িতা তো নয়ই,এমন কি কোন ইউরোপীয় রচয়িতা কখনো ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গি এত ব্যাপক পরিসরে এবং দর্শনগত ভাবে গ্রহন করেন নি। ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে একমত যে, ইবনে খালদুন কেবলমাত্র ইসলামী পৃথিবীর সব থেকে বড় ইতিহাসবিদ ছিলেন না বরং তিনি সমগ্র যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইতিহাসবিদ ছিলেন।[৭০]

ইবনে খালদুন তার মোকদ্দমার প্রথম খণ্ডে সমাজবিজ্ঞানের একটি সাধারণ চিত্র অংকন করেছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে রাজনীতি, চতুর্থ অধ্যায়ে নগরজীবনে সমাজবিজ্ঞান, পঞ্চম খণ্ডে অর্থনৈতিক সামাজবিদ্যা এবং ষষ্ঠ খণ্ডে বৌদ্ধিক সামাজবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটিতে ইতিহাস রচনা, অর্থনীতি, রাজনীতি ও শিক্ষা সম্পর্কে অতি চমৎকার ও জ্ঞানদীপ্ত পর্যালোচনা করা হয়েছে। আসাবিয়া বা সামাজিক সংশক্তির ধারণাটি হলো গ্রন্থটির মূল সূত্র। এইভাবে তিনি ইতিহাস রচনার যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি স্থাপন করেন তা কেবলমাত্র রাজা মহারাজাদের কীর্তিকলাপের মধ্যে সীমায়িত হয়নি; বরং এরমধ্যে সমগ্র জাতির অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, ধর্ম, নৈতিকতা ও সংস্কৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ইতিহাস বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞগণ একথা সর্বাত্মকভাবে স্বীকার করেছেন যে, ' আবদুর রহমান ইবনে খালদুনের' আত্মপ্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত ইতিহাস বিজ্ঞান অনুন্নত অবস্থায় পড়ে ছিলো। ইবনে খালদুনই প্রথম ব্যক্তি যিনি নতুন ইতিহাস রচনার দর্শন উদ্ভাবন করেন। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে আরও বলা হয়েছে, তিনি (ইবনে খালদুন) বিশ্বের মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস-দর্শনের বিকাশসাধন করেন।[৭১]

কিন্তু প্রশ্ন হলো, স্বয়ং ইবনে খালদুনের জন্য এই আবিষ্কার কিভাবে সম্ভবপর হলো যা বহু শতাব্দী ধরে অনাবিষ্কৃত ছিল? এই প্রশ্নটির সহজ জবাব হলো, অন্যান্য ইতিহাসবিদগণ ইসলামী বিপ্লবের পুর্বে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ইবনে খালদুন ইসলামী বিপ্লবের পরে জন্মগ্রহণ করেন। একেশ্বরবাদের উপর ভিত্তি করে ইসলাম যে বিপ্লব নিয়ে আসে সেখানে রাজা ও সাধারণ নাগরিকের মধ্যেকার ব্যবধান বিলুপ্ত হয়েছিল। সমগ্র মানবজাতি আদম-ইভের সন্তান, সেই জন্য সকলেই সমান। একান্তভাবে এই মহান সমতার বিপ্লব ইবনে খালদুনের জন্য (যিনি নিজে ছিলেন এই বিপ্লবের ফসল) আধুনিক ইতিহাস রচনার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পথকে সহজ করেছিলেন, যেখানে রাজা নয় বরং সমগ্র মানবতাই হলো ইতিহাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র।

ইতিহাসবিজ্ঞানের উন্নয়নের পথে যে বিশ্বাস প্রতিবন্ধক হয়ে কাজ করেছে সেটি হল বহুশ্বরবাদ। ইসলামের পূর্বে সকল যুগ ঐশ্বরিকরাজ (রাজা-বাদশাহগণ ঈশ্বরিক ক্ষমতার আধার) ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখানে রাজা নিজেকে জনগণ ও তাদের ঈশ্বরের মধ্যে মধ্যস্থকারী হিসাবে উপস্থাপন করতো অথবা রাজা বাদশাহ নিজেকে ঈশ্বরের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে ঘোষণা করতো।[৭২] কোন কোন রাজা নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বা নিজেই ঈশ্বর এমন ঘোষণা করতো। এই ঐশ্বরিক ক্ষমতার জন্য রাজার সার্বভৌমিকতাকে কেউই অস্বীকার করতে পারত না। এমনকি রাজা ঐশ্বরিক ক্ষমতার দাবি না জানালেও তার উপর এই ক্ষমতা আরোপ করা হতো, কারণ সমগ্র বিশ্বে তখন এমন প্রথাই প্রচলিত ছিল। সাধারণ মানুষ যদি অকস্মাৎ অস্বাভাবিক কিছুর সম্মুখীন হতো তারা সেটাকে অতি প্রাকৃতিক বিষয় হিসাবে গণ্য করতো এবং যদি তা মানুষের দ্বারা সংগঠিত হতো তবে তাকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হিসাবে ধারণা করতো। স্বাভাবিকভাবে রাজারা এই মানসিকতাকে কখনোই অনুৎসাহিত করতো না।

বিপরীতক্রমে প্রাচীন শাসকগণ এই ধরনের মানসিকতাকে উৎসাহিত করতেন, যাতে তাদের নিজেদের মহত্বতা বজায় থাকে। ঐতিহাসিকভাবে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সর্বপ্রথম এই প্রকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণাকে খণ্ডন করেন এবং দেখিয়ে দেন এই প্রকার ধারণার কোন ভিত্তি নেই। এইভাবে তিনি খুবই যুক্তিপূর্ণভাবে মানুষের মধ্যেকার বিভেদ মুছে দিয়ে সমগ্র মানবজাতিকে আলোর পথে পরিচালিত করেন। যে সমস্ত কুসংস্কার গুলি মানুষের মাঝে দাস-মালিক সম্পর্ক সৃষ্টি করেছিল, তিনি সেগুলির মূলোৎপাটন করেছিলেন।

পয়গম্বর মুহাম্মদ (সঃ) এর জীবনের শেষের দিকে মারিয়া কিবতীয়া একটি ফুটফুটে প্রানবন্ত সন্তান জন্মদান করেন। নবী (সাঃ) তাঁর সন্তানটির নাম তাঁর পূর্বপুরুষ ইবরাহীমের নামে রেখেছিলেন। ইবরাহীম মাত্র দেড় বছর বয়সে আরবী ১০ম হিজরির শাওয়াল মাসে (জানুয়ারি, ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে) মৃত্যু বরন করেন। ঘটনাচক্রে ঐ দিনে সূর্যগ্রহন হয়েছিল। প্রাচীন যুগে যে সকল কুসংস্কারাচ্ছন্ন

বিশ্বাস প্রচলিত ছিলো, তার মধ্যে একটি হল, যদি কোন রাজা-বাদশাহ্ বা বড় কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের তিরোধান হয় তখন সূর্য অথবা চন্দ্র গ্রহন হয়। কারণ এরূপ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মৃত্যুতে আকাশও শোক পালন করে। সেই হিসেবে, নবী মুহাম্মদ (সা:) তখন আরব দেশের সম্রাট ছিলেন। সেজন্য মদীনার কিছু মুসলিম তাদের প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভাবতে শুরু করেন যে, নবী (সঃ) এর পুত্রের মৃত্যুর কারনে সূর্য গ্রহণ হয়েছে। যখনই এরূপ বাক্য পয়গম্বরের কর্ণ গোচর হলো, সাথে সাথে তিনি এমনতর কুসংস্কারময় বিশ্বাসের বিরোধিতা করেন। বেশ কয়েকটি হাদিসে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

একদিন সূর্যগ্রহন শুরু হলে নবী মুহাম্মদ (সা:) তড়িৎগতিতে মসজিদে চলে গেলেন এবং নামাজ আদায় করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে সূর্যগ্রহণ সমাপ্ত হল। তারপর তিনি সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, অজ্ঞতার যুগের মানুষেরা ভাবতো পৃথিবীর কোন বড় মানুষ মৃত্যুবরন করলে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহন হয়ে থাকে কিন্তু এটা সত্য নয়। আসলে কোন মানুষের মৃত্যুতে চন্দ্র বা সূর্য গ্রহন হয় না; বরং এ দুটি জিনিস স্রষ্টার সৃষ্টি সমূহের মধ্যে দুটি সৃষ্টি। ঈশ্বর যেভাবে চান সেভাবেই তিনি তার সৃষ্টি জগতের পরিবর্তন আনেন। অতএব যখনই গ্রহন হয় তোমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করবে।[৭৩]

যখন সমগ্র আরব ভূখন্ডে ইসলামের আধিপত্যের বিস্তার ঘটে তখন ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সা:) এক লক্ষ পঁচিশ হাজার (১,২৫,০০০) সাহাবীসহ তাঁর সর্বশেষ হজ্জ বা বিদায়ী তীর্থযাত্রা করেছিলেন। সেই বিদায়ী তীর্থযাত্রার সময় তিনি আরাফার মাঠে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন। যাকে 'খুতবায়ে হজ্জাতুল বিদা' (বিদায়ী হজ্জের ভাষণ) বলা হয়।

এই ভাষণটি ছিল পৃথিবীর বুকে প্রথম মানবাধিকারের ঘোষণা। তিনি ঘোষণা করেছিলেন হে মানবসকল ! শুনে রাখো, সমগ্র মানব জাতি এক পুরুষ এবং এক নারী থেকে জন্ম লাভ করেছে। তাদের মাঝে যে বিভিন্ন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তা শুধুমাত্র পরিচয় ও সনাক্তকরণের জন্য। ঈশ্বরের নিকট সেই ব্যক্তিই

সব থেকে সন্মানিত ও মর্যাদাবান, যে ঈশ্বরকে অধিক পরিমান ভয় করে। কোন অনারবের উপর কোন আরবীয়ের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আবার কোন আরবীয়ের উপর কোন অনারবের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব নেই। ঠিক তেমনি ভাবে কোন কৃষ্ণাঙ্গের উপর কোন শ্বেতাঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং কোন শ্বেতাঙ্গের উপরে কোন কৃষ্ণাঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি হলো ঈশ্বরভীতি। অতঃপর তিনি আরও বলেন, "হে জনতা! শুনে রাখো, ইসলামের পূর্বের অজ্ঞতাপূর্ণ সকল বিষয় আমার পদচারনার দ্বারা নিশ্চিহ্ন হয়েছে।" প্রাচীন ইতিহাসে এটাই প্রথমবার মানুষের মাঝে বিদ্যমান সমস্ত ধরণের বৈষম্য এবং বিভেদ প্রায় সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা সম্ভব হয়েছিল।

অতঃপর মানব জগতে এক নব সভ্যতার জন্ম হয়। যে সভ্যতায় সকল মানুষই একই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। মহান পয়গম্বরের উত্তরসূরী হযরত আবু বকর (রা:) ও হযরত ওমর (রা:) সম্পর্কে মহাত্মাগান্ধী বলেন, 'যদিও তারা সুবিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন,তথাপি তারা মানুষের মাঝে কপর্দকশূন্য (বিত্তহীন) মানুষের ন্যায় জীবনযাপন করতেন।

এই বিপ্লব এতটাই শক্তিধর ছিল যে তৎপরবর্তীকালে যখন রাজনৈতিক অঙ্গনে বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল এবং খিলাফতের যুগ শেষ হয়ে সুলতানী যুগের সূচনা হয়েছিল তখনও ইসলামী সভ্যতায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ধারার চাপে এমন পরিস্থিতি ছিল যে, কোন সুলতানই আর প্রাচীন বাদশাহদের আদলে রাজত্ব করতে সক্ষম হন নি। এই সম্পর্কে অসংখ্য ঘটনা ইতিহাসের পাতায় মজুদ রয়েছে। এখানে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হলোঃ

মুসলিম স্পেনে সুলতান দ্বিতীয় আবদুর রহমান (১৭৬-২৫৮) একজন প্রভাবশালী এবং ক্ষমতাধর শাসক ছিলেন। এই সুলতান নিজের জন্য কর্ডোভার পূর্ব দিকে আজ-জাহরা নামে এক রাজপ্রাসাদ নির্মান করেছিলেন। এই প্রাসাদ এতটাই বিশাল ছিল যে, বর্ণনা করার মতো কোন শব্দই উপযুক্ত ছিল না। এই চমৎকার রাজপ্রাসাদটিকে আল মদীনা আয জাহরা (চমৎকার শহর) বলা

হতো। এতো ক্ষমতাধর এবং এতো চমৎকার রাজপ্রাসাদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও সুলতান কখনও নিজেকে আইনের উর্ধে ভাবতেন না।

কোন এক বছর রমাদান মাসে তাঁর একটি রোজা পালন করা হয়নি। এর জন্য তিনি শরিয়ত সম্মত কোন কারণ দর্শাতে পারেন নি। অতএব তিনি কর্ডোভার বিশিষ্ট ধর্মীয় পণ্ডিতদের রাজদরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। তাঁরা উপস্থিত হলে, তাঁদের সম্মুখে নিজের ঘটনাটি ব্যক্ত করে একজন সাধারণ মানুষের মত ধর্মীয় সিদ্ধান্ত জানতে চান।

আল মাক্কারী লিখেছেন,উপস্থিত ধর্মীয় পণ্ডিতদের মধ্যে ইমাম ইয়াহইয়া উপস্থিত ছিলেন। ইমাম ইয়াহইয়া বিষয়টি শুনে সুলতানকে জানালেন তাঁকে একটানা ৬০ টি রোযা করতে হবে। যখন ইমাম ইয়াহইয়া তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে রাজ দরবার থেকে প্রস্থান করছিলেন তখন পেছন থেকে অন্য একজন পণ্ডিত তাঁকে প্রশ্ন করলেন, কেন তিনি সুলতানের জন্য এত কঠিন সিদ্ধান্ত জানালেন, যদিও ধর্মীয় বিধিতে আরো সহজতর ও বিকল্প পদ্ধতি আছে। ৬০ জন অভাবী মানুষকে খাদ্য দান করার বিকল্প বিধান ধর্মীয় বিধিমতে গ্রহণীয় ছিল।

এই উক্তি শুনে ইমাম ইয়াহইয়া অগ্নিশর্মা হয়ে ঐ পণ্ডিতকে বলেছিলেন রাজা-বাদশাহদের জন্য মাত্র ৬০ জন অভাবী মানুষকে খাদ্য প্রদান, তাঁদের নিকটে অতি তুচ্ছ ব্যাপার। এটা কোন শাস্তিই নয়। আন্দালুসের ইতিহাস থেকে জানা যায় সুলতান দ্বিতীয় আবদুর রহমান সিদ্ধান্তটি মেনে নিয়ে একাধারে ৬০ টি রোজা পালন করেছিলেন। আর এই জন্য তিনি কোন প্রকার অসুন্তষ্টি জ্ঞাপন করেননি। এমনকি ইমাম ইয়াহইয়াকেও তাঁর ধর্মীয় পদ থেকে বহিষ্কার করেননি।[৭৪]

ইসলাম যে বিপ্লব ঘটিয়েছিল, এটি তার প্রভাবেই সম্ভব হয়েছিল। সেই বিপ্লব রাজা ও প্রজার মধ্যে থাকা সকল ব্যবধান দুর করে দিয়েছিল। ঐ বিপ্লব মানব সমাজে এমন এক পরিবেশ কায়েম করেছিল যে কোন ব্যক্তিই নিজেকে অন্যের থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করতো না। কোন সুলতানের সাহস হতো না যে তিনি নিজেকে প্রজাবৃন্দ থেকে শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করবেন এবং আইনের উর্ধে মনে করবেন।

অথচ ইসলামের পূর্বে এটি সর্বজন স্বীকৃত ছিল যে, রাজা-বাদশাহরা সাধারণ মানুষ থেকে শ্রেষ্ঠতর। উদাহরণস্বরূপ - পয়গম্বর মুহাম্মদ (সা:) এর সমসাময়িক বাইজান্টাইন সম্রাট হেরাক্লিয়াস নিজেকে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ঘোষণা করার পরও নিজের ভ্রাতুস্পুত্রী মার্টিনাকে বিবাহ করেছিলেন, যা স্পষ্ট খ্রিষ্টীয় বিধান বিরোধী কর্ম ছিল এবং সাধারণ মানুষ এটাকে অনাচার হিসাবে গণ্য করতো।[৭৫]

জনগণ জানতো এটা একটা অবৈধ সম্পর্ক। তারপরও তারা নিশ্চুপ থেকেছে। তার কারণ হলো, হেরাক্লিয়াস রাজা ছিলেন। আর রাজা-বাদশাহর এই অধিকার ছিল যে, তিনি যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন। তারা সকল মানবীয় আইনের উর্ধে।

পূর্ববর্তী যুগে বিভিন্ন প্রকার কুসংস্কারময় বিশ্বাসের দ্বারা উৎপন্ন রাজা-বাদশাহর শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাস মানুষের মস্তিষ্কে এমনভাবে চেপে বসে ছিল যে তারা তাদের শাসকদেরকে তাদের থেকে ভিন্ন এবং উচ্চতর কোন মহান সৃষ্টি মনে করতো। স্বয়ং শাসক শ্রেণীগুলিও বিভিন্ন রীতি ও আদব কায়দা প্রচলনের দ্বারা উক্ত মতাদর্শের পৃষ্ঠপোষকতা করতো। এইভাবে তৎকালীন শাসকশ্রেণী তাদের শাসনাধীন অঞ্চলে যে প্রকার পার্থিব মর্যাদার আসনে নিজেদেরকে অধিষ্ঠিত করতো, তা এ মহাবিশ্বে কেবলমাত্র ঈশ্বরের জন্যই নির্ধারিত ছিল। স্বভাবিকভাবেই ইতিহাস লিপিকারদের বিদ্যাও রাজার ঐশ্বরিক ক্ষমতার মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত ছিল। আর সেজন্যই তৎসময়ে ইতিহাস বলতে রাজা বাদশাহদের ঘটনাপঞ্জী হিসেবে লিপিবদ্ধ হতো, সাধারণ মানুষের জীবন উপেক্ষিত থাকতো।

আরবসহ অন্যান্য দেশগুলিতে যখন ইসলামী বিপ্লবের আগমন ঘটে, তখন তা যেভাবে চন্দ্র ও সূর্যকে ঈশ্বরের স্থান থেকে অপসারণ করে, ঠিক অনুরূপ ভাবে রাজা-বাদশাহ বা শাসকশ্রেণীকেও ঐশ্বরিকতার আসন থেকে অপসারণ করে। এখন রাজা হলেন অন্যান্য মানুষের মতো একজন মানুষ।

ইসলামী আন্দোলনের প্রভাব এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের অধিকাংশ

দেশে পৌঁছে যায়। আর এর দ্বারাই সমগ্র বিশ্বে এক নতুন পরিবেশের জন্ম হয়। মানুষের মাঝে এক নব চেতনা জাগ্রত হয়। প্রাচীন রাজকেন্দ্রীক (King Centred) মানসিকতার অবসান হয় এবং সেই স্থানে মানব কেন্দ্রীক (Man Centred) মানসিকতার জন্ম হয়। ইতিহাস বিজ্ঞানের জন্য এই মানসিকতা যিনি প্রথম স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, তিনি হলেন আবদুর রহমান ইবনে খালদুন। তিনি নতুন পদ্ধতিতে একটি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করা শুরু করেন। যার সংক্ষিপ্ত নাম হলো, 'কিতাব আল-ইবার'। এই গ্রন্থটির মুখবন্ধে তিনি ইতিহাসবিজ্ঞানের কলা সম্পর্কে বিস্তারিত অলোচনা উপস্থাপন করেন। আর এই মুখবন্ধ বা মুকদ্দমা এত অধিক মূল্যবান যে বিভিন্ন ভাষায় বহুবার এটি প্রকাশিত হয়েছে।

মামলুক ঐতিহাসিকদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান ঐতিহাসিক হলেন, "আল মাকরিজি" (Al Maqrizi)। তিনি ইবনে খালদুনের শিষ্য ছিলেন। পঞ্চদশ শতকে তার মাধ্যমে ইবনে খালদুনের চিন্তাদর্শনগুলি মিশরে বিস্তার লাভ করে। অতঃপর অন্যান্য মুসলিম দেশগুলিতে তাদের ঐতিহাসিক চিন্তাদর্শনের প্রসার ঘটে। ১৮৬০ এবং ১৮৭০ এর মধ্যবর্তী সময়ে 'মোকদ্দমার' পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত হয়। আর এভাবেই ইবনে খালদুনের ঐতিহাসিক চিন্তাধারা ইউরোপে পৌঁছায়। তাঁর এসকল চিন্তাদর্শন ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। শেষ পর্যন্ত সপ্তদশ শতকে ভিকো (Vico Giambattista) এবং অন্যান্য পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের জন্ম হয়। তাঁরাও এই কাজের ব্যাপক অগ্রগতি ঘটিয়ে শেষপর্যন্ত আধুনিক ইতিহাসবিজ্ঞানের সূচনা করেন।

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব

প্রতিটি দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের কাঙ্খিত স্বপ্নগুলির মাঝে অন্যতম স্বপ্ন হলো সমতা ও ভ্রাতৃত্ব। ইসলামের পয়গম্বর যে বিপ্লব সংঘটিত করেছিলেন তার দ্বারা মানব ইতিহাসে প্রথমবার প্রকৃত অর্থে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই বিষয়টি বিজ্ঞ মহল বেশ গুরুত্বের সাথে স্বীকার করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, স্বামী বিবেকানান্দ তাঁর লিখিত চিঠিগুলির মধ্যে - ১৭৫ নং চিঠিতে লিখেছিলেন, "যদি কোন ধর্ম কখনও এই পৃথিবীতে লক্ষণীয়ভাবে সাম্য প্রতিষ্ঠা করে থাকে তবে তা কেবলমাত্র ইসলামই করেছে।"[৭৬]

ইতিহাসের পাতায় মানব বৈষম্যের মতো অনৈতিকতা পরিলক্ষিত হওয়ার মূল কারন হলো বহুশ্বরবাদ যা বছরেরে পর বছর ধরে মানব উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছিল। বহুশ্বরবাদ মূলত মানব অসমতাকে চিরঞ্জীব করে রেখেছিল, একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার পরই কেবলমাত্র মানব সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

মানুষের মাঝে মূলত প্রকৃতি ও দৈহিক ভাবে বেশ কিছু ভিন্নতা বংশগত বা অধিগতকারনে পরিলক্ষিত হয়। যেমন, কেউ কৃষ্ণাঙ্গ আবার কেউ শ্বেতাঙ্গ। কেউ ধনী আবার কেউ গরিব। কেউ শাসক আবার কেউ শাসিত। এর কারন সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে - শনাক্তকরণের জন্য এই ভিন্নতা (৪৯ ঃ ১৩)। বৈষম্য সৃষ্টি করার জন্য নয় বরং পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য। কারো কারো মতে এই ভিন্নতা শ্রেনীবিন্যাসের জন্য যাতে পৃথিবীকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা যায়। এর অর্থ এই নয় যে, মানুষের মাঝে কেউ উচ্চ শ্রেণী হবে আর কেউ হবে ম্লেচ্ছ। এই ভিন্নতা শুধু এজন্য যে, যাতে করে বিশ্বের বৈচিত্রময় ক্রিয়াকলাপের কাঠামো সঠিক ও সুন্দর ভাবে পরিচালিত হতে পারে।

প্রাচীন যুগে বহুশ্বরবাদের প্রভাবে যে সকল কুসংস্কারের উদ্ভব হয়েছিল তা যেভাবে প্রাণী জগত সম্পর্কে অদ্ভুত ও অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছিল, ঠিক অনুরূপভাবে মানুষের বিষয়েও সমগ্র বিশ্বে অবাস্তব কিছু ধারণা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কয়েক শতাব্দী পথ চলার পর ঐ ধারণাগুলি আস্তে আস্তে মানব ঐতিহ্যের অংশে রূপান্তরিত হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ - এই সকল কুসংস্কারের প্রভাবে কোন কোন সমাজে জাত-পাতের অর্থাৎ বর্ণবাদের জন্ম হয়। বলা হলো, কিছু মানুষ ঈশ্বরের মাথা থেকে জন্ম নিয়েছে, আর কিছু মানুষ ঈশ্বরের পা থেকে। এর দ্বারা তারা নিজেদেরকে উচ্চ ও নিম্ন বর্ণে বিভক্ত করলো। আবার এভাবেই রাজা-বাদশাহদের বিষয়ে বিশ্বাস তৈরি হল যে,তারা ঈশ্বরের বংশদ্ভুত। আর সাধারণ মানুষের জন্মই হয়েছে তাদের সেবা করার জন্য। কোথাও কোথাও এই দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, কেউ জন্মগত ভাবে উচ্চ বংশের আবার কেউ জন্মগত ভাবেই নিম্ন বংশের।

অসাম্যের ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত বৈষম্যের এই রীতি বহুশ্বরবাদের প্রভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সমাজে বিদ্যমান থাকার কারণে তা মানব ইতিহাসের চিরস্থায়ী বৈশিষ্ট্য বলে ধারণা হতে থাকে। এমন ধারণাও হতে থাকে যে রাত্রি যেমন অন্ধকার, দিন যেমন আলোকময় ঠিক তেমনি মানুষের মধ্যকার এই বিভেদ এক অপরিবর্তন যোগ্য চিরস্থায়ী বৈশিষ্ট্য। এই প্রভেদ পূর্বেও যেমন ছিল, ভবিষ্যতেও তেমনই থাকবে এটাই দেবতাগণের অভিলাষ।

এরূপ অবস্থার বিলুপ্তির জন্য বহুশ্বরবাদ ও কুসংস্কারের প্রথা রদ করা অপরিহার্য ছিল। কিন্তু হাজার হাজার পয়গম্বরের আগমনের পরও একে অবদমিত করা সম্ভব হয়নি। হযরত মুহাম্মদ (সা:) শেষ পয়গম্বর হওয়ার কারনে কুসংস্কারের আধিপত্য কার্যকরীভাবে বিলুপ্ত করে দেওয়া একান্তভাবে অত্যাবশ্যক ছিল। প্রত্যেক পয়গম্বর নীতিগতভাবে এই ধরনের বিশ্বাসকে বিলোপ সাধন করেন; কিন্তু কার্যগতভাবে সাধারণ মানুষ তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে এই প্রথাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। ফলে কুসংস্কারকে বাস্তবিকভাবে উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়নি। ঈশ্বর, মুহাম্মদ (সা:) কে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করলেন। তিনি তাঁর অনুগত সাথীদের

নিয়ে এমন এক বৌদ্ধিক বিপ্লবের সূচনা করেন যার ফলে সেই সকল তথাকথিত অন্ধ অনুশাসনগুলি সার্বিকভাবে অবলুপ্ত হয়। আর এভাবেই অসাম্যের ধারণাটি সমূলে উৎপাটিত হয়।

বহুশ্বরবাদের বিলোপ সাধন সম্পর্কে পয়গম্বর তাঁর বিদায়ী হজ্জে (তীর্থযাত্রায়) সমবেত জনতার উদ্দেশ্য তাঁর অন্তিম ভাষণে বলেনঃ অনারবের উপর আরবের, অথবা আরবের উপর অনারবের, শ্বেতাঙ্গের উপর কৃষ্ণাঙ্গের অথবা কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের কোন প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সকলেই আদম সন্তান এবং আদম (অ্যাডাম) কে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে।'[৭৭]

মুহাম্মদ (সাঃ) এর এই উপদেশ বাণী শুধুমাত্র উপদেশ বাণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তা রাষ্ট্রপ্রধান কতৃক এক রাষ্ট্রিয় ফর্মান ছিল। 'কি করা উচিত' এই বিষয়ে এটা কেবলমাত্র একটি মৌখিক নির্দেশনা ছিল না,বরং তা ছিল তৎকালীন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিদ্যমান পরিস্থিতির একটি বাস্তব চিত্র। এই নির্দেশনার লক্ষ্য কেবলমাত্র অনবহিতদের অবহিত করা নয় বরং এর লক্ষ্য ছিল সামাজিক অবস্থা আরো মজবুত করা। মানবতার মাঝে সকল প্রকার কাল্পনিক বৈষম্যের প্রাচীর ধসিয়ে দিয়ে সমগ্র মানব জাতিকে এক নতুন জগতে প্রবেশ করানো হয়, যেখানে কোনো উচ্চ-নিম্নবর্ণ এবং বৈষম্য ছিল না। মানুষের চরিত্র এবং কৃতিত্বের মানদণ্ডে কোন ব্যাক্তির সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হতো, তার জন্ম বা বংশমর্যাদার মানদণ্ডে নয়।

একটি ঘটনা

প্রাচীন যুগগুলিতে যখন কোন মানুষ সামাজিক ভাবে বৈষম্যের শিকার হতো তখন সে প্রতিবাদ করতে পারত না, কারন সে ভাবতো যে তার নিয়তির কারণেই এমন হয়েছে। লাঞ্ছিত, নিগৃহীত হলে সে তার নিম্নবর্ণে জন্ম নেওয়ার কারণকে দায়ী করত। এমন পরিস্থিতি চলাকালীন, বিশ্ব ইতিহাসে প্রথমবার এমন ঘটনা ঘটল যা সমগ্র বিশ্বে এক অনন্য নজির স্থাপন করল। ঘটনাটি দ্বিতীয় খলীফা

হযরত ওমর ফারুক (রা:) এর খিলাফত কালের। এক সময়ে মিশর মুসলমানদের দখলে আসে। আমর বিন আল আস সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত হন। একদিন এক মিশরীয় খ্রিষ্টান (কিবতি) যুবক খলিফার দরবারে এসে অভিযোগ করে যে গভর্নরের ছেলে তাকে বেত্রাঘাত করেছে এবং শাসিয়ে বলেছে যে-"মনে রেখো, আমি সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান।" তার এহেন নির্লজ্জ আচরণের কারণ ওই মিশরীয় যুবকটির ঘোড়া তার ঘোড়াকে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় পরাজিত করেছিল। ইসলামী বিপ্লবের ফলে যে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তা অবগত হয়েই যুবকটি খলিফার কাছে ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য এসেছিল। খলিফা তৎক্ষণাৎ আমর বিন আল আস এবং তার পুত্রকে অবিলম্বে মদিনায় নিয়ে আসার জন্য একজন দূত প্রেরণ করলেন। মদিনায় এসে তারা খলিফার সম্মুখে হাজির হলেন। খলিফা তখন সেই মিশরীয় যুবককে হাজির করিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই কি সেই যুবক, যে তোমাকে বেত্রাঘাত করেছিল?" মিশরীয় যুবকটির নিকট হাঁ-সুচক জবাব পাওয়ার পর খলিফা যুবকটির হাতে একটা চাবুক তুলে দিয়ে ওই সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবককে বেত্রাঘাত করতে বললেন। মিশরীয় যুবকটি তাকে যথোচিত বেত্রাঘাত করল। তখন খলিফা ওই অন্যায়কারীর বাবা আমর ইবনে আল আসকে বেত্রাঘাত করতে বললেন, কারণ খলিফার মতে তিনি সম্ভ্রান্ত হওয়ার কারণে তার পুত্র এমন অন্যায় কর্ম করতে সাহস পেয়েছে। কিন্তু মিশরীয় যুবকটি তাকে বেত্রাঘাত করতে অস্বীকৃতি জানায়, কারণ তার উপর যে অন্যায় করেছিল সে তাকে বেত্রাঘাত করেছে, এর বেশি সে কিছু চায়না।

যখন এই বিচার কার্য সমাপ্ত হলো, তখন মহান খলিফা হযরত উমর (রাঃ) মিশরের গভর্ণর আমর ইবনুল আস (রাঃ) এর দিকে তাকিয়ে বললেন, "হে আমর! তুমি কবে থেকে জন্মগতভাবে স্বাধীন মানুষদেরকে গোলাম বানানো শুরু করলে?"

মুহাম্মদ (সা:) ও তাঁর অনুগত সাথীদের দ্বারা আনীত মহান বিপ্লব সমগ্র জগতব্যাপী সমস্ত প্রকার বৈষম্যের দেওয়াল নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। মানব সমাজে এক সাম্যের যুগের সূচনা হয় যার মধ্য দিয়ে আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যাবস্থা বিকশিত হয়েছে।

প্রাচীন যুগগুলিতে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা বহুশ্বরবাদে আচ্ছন্ন মতাদর্শের দ্বারা পরিচালিত হতো। জনগণ চাঁদ ও সূর্যকে পূজো করতো। আর সেই সকল জনগণকে রাষ্ট্রপ্রধান কতৃক বিশ্বাস করানো হতো যে, তারা দেবতাদের সন্তান। এর থেকেই ভারতবর্ষে সুরাজ বানশি (Suraj Bansi) বা সূর্যের বংশ ও চন্দ্র বানশি (Chandra Bansi) বা চাঁদের বংশ নামে বহু পরিবারের অস্তিত্ব আজও বর্তমান। প্রাচীন যুগের শাসকরা এরূপ কুসংস্কার ও মিথ্যা মতাদর্শ গুলি আরও মজবুত করার প্রচেষ্টা চালাতো। তারা চাইতো যে, মানুষের মাঝে এরূপ বিশ্বাস তৈরি হোক যে, রাজা-বাদশাহদের মৃত্যুতে চন্দ্র ও সূর্যের গ্রহন হয়। এই অন্ধবিশ্বাস যতদিন জনতার মাঝে বিদ্যমান থাকবে ততদিন তারা বিনা প্রতিবাদ ও বিনা বিদ্রোহে একছত্র রাজত্ব করতে পারবে।

এভাবেই প্রাচীন যুগের শাসকশ্রেণী এসকল বহুশ্বরবাদ ও কুসংস্কারের ধারক ও বাহক হয়ে বসে ছিল। হযরত মুহাম্মদ (সা:) যখন রাষ্ট্রপ্রধানের আসন অলঙ্কৃত করে ঘোষণা করলেন যে, চাঁদ ও সূর্যের গ্রহণ প্রাকৃতিক ভাবে ঘটে, কোন মানুষের গুরুত্ব ও মহাত্ম্য প্রকাশ করার জন্য নয়, তখন থেকেই কুসংস্কারের উপাসনা ও দৃশ্যত প্রাকৃতিক বস্তুকে পবিত্র জ্ঞান করার প্রাচীন বিশ্বাসগুলি অন্তর্হিত হল। আর ইতিহাস নতুন ভাবে যাত্রাশুরু করলো। যখন দৃশ্যমান সকল বস্তু সম্পর্কে ঐশ্বরিকতা ও পবিত্রতার মতাদর্শ বিলুপ্ত হয় এবং সেই স্থানে এমন এক বাস্তব ধর্মীতার জন্ম হয়, যা শেষ পর্যন্ত আধুনিক অর্থে বৈজ্ঞানিক চিন্তনের সূচনা করে।

নবী মুহাম্মদ (সা:) এর নিকট থেকে বিশ্বমানব শুধু এটাই পায়নি, বরং তার সাথে আরও পেয়েছে ঐশ্বরিক মহাগ্রন্থ আল কুরআন; তাতে অতি গুরুত্বের সাথে এই কথা বলা হয়েছে যে, আকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা দয়াময় ঈশ্বর মানব জাতির ব্যবহার ও কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন (৩১:২০)। এর ফলশ্রুতিতে দেখা গেল বস্তু মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর,এমন পূর্বতন ধারণার বশবর্তী হয়ে তাদের সামনে প্রণত হওয়ার পরিবর্তে,বস্তু দ্বারা মানুষের প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে তাকে বশ মানানোর কথা তারা ভাবতে শুরু করলো।

নব সভ্যতার সৃষ্টি

হযরত মুহাম্মদ (সা:) যে ধর্মের কথা বলেছিলেন, তা এক সময় সমগ্র আরব জাতি গ্রহণ করে নেয়। অতঃপর সেই ধর্ম অবাক করা দ্রুততার সাথে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং এক শতাব্দীর ব্যবধানে এটি এশিয়া ও আফ্রিকা ছাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত ইউরোপে পৌঁছেছিল। আমেরিকা বাদে বিশ্বের প্রায় সমস্ত দেশ, সমস্ত সাগর-মহাসাগর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই ধর্মের অনুসারীদের দ্বারা প্রবাভিত হল।

আর এই যাত্রা নিরবচ্ছিন্নভাবে এক হাজার বছর চলমান ছিল। নাইজেরিয়ার সুকুটো (Sukutu) খেলাফত থেকে নিয়ে ইন্দোনেশিয়ার মুসলিম সুলতান পর্যন্ত, অন্যদিকে তুর্কী উসমানী (Ottoman Empire) খিলাফত থেকে নিয়ে ভারতের মুঘল সাম্রাজ্য পর্যন্ত ভূগোলকের এই বিস্তৃত অঞ্চলে বর্তমানে যে রাজনৈতিক ও ভৌগলিক সীমারেখা আমরা প্রত্যক্ষ করি, সেই সময়ে এর কোন অস্তিত্ব ছিল না। মুসলিমরা এই সমস্ত মুসলিম শাসনাধীন রাজ্যে বাণিজ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে অতি সহজে ভ্রমণ করতে পারতো।

চৌদ্দ শতাব্দীর এই সময়কালে সব থেকে সুপরিচিত ভ্রমণকারী ইবন বতুতা (Ibn Batuta) প্রায় ৭৫ হাজার মাইল পথ ভ্রমণ করেন। তিনি এক দেশ থেকে অন্য দেশে এমন ভাবে পৌঁছতেন যেন মনে হত তিনি অপরিচিত কেউ নন। ভ্রমণরত অবস্থায় কোনো স্থান বা দেশেই তার বেকারত্বের সম্মুখীন হতে হয়নি। তিনি (ইবন বতুতা) মুহাম্মদ বিন তুঘলকের (১৩২৫ - ৫১) রাজত্বকালে ভারতের দিল্লিতে আগমন করেন। সেখানে আগমন করে তিনি শুধু উপহার উপটৌকনই পান নি বরং সেই সাথে তাঁকে দিল্লির প্রধান কাজী (Judge) হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।[৭৮]

এই সর্বজনীন বিপ্লবের ফলস্বরূপ সমগ্র মানব জাতি এক বিস্তৃত ভূখণ্ড ব্যাপী যে বৃহৎ ভ্রাতৃত্ব উপহার পেয়েছিল যা মানুষের চিন্তার জগতে লক্ষণীয় ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রভাব সর্বপ্রথম মদিনার সমাজ জীবনে পরিলক্ষিত

হয়, তারপর তা দামাস্কাস হয়ে বাগদাদে বিস্তার লাভ করে। আবার স্পেন, সিসিলি হয়ে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোতে এই ভাবধারা ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপের অধিকাংশ মানুষ ধর্মীয় দিক দিয়ে ইসলামকে গ্রহণ না করলেও বিশ্ব সম্পর্কে ইসলাম যে একত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে তা পূর্ণ রূপে গ্রহণ করে এবং এর থেকে পরিপূর্ণ সুফল অর্জন করে। বাস্তবিকভাবেই ইউরোপের বৈজ্ঞানিক ও গণতান্ত্রিক বিপ্লব মূলত ইসলামের একত্ববাদী বিপ্লবের একটি ধর্মনিরপেক্ষ সংস্করণ। এই শব্দবন্ধ দ্বারা একথা আভাসিত হয় যে, পাশ্চাত্যগণ ইসলামী বিপ্লব থেকে ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতার অভিব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে।

একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে,মানব ইতিহাস থেকে যদি ইসলামের পর্বকে মুছে দিতে হয়, তাহলে সমস্ত সামাজিক ও মানবিক উন্নয়ন গুলিও একইসাথে মুছে দিতে হবে। তাহলে পৃথিবী আবার সেই অন্ধকার যুগে ফিরে যাবে,যে যুগে ইসলামী বিপ্লবের আলো পৌঁছানোর পূর্ব সময় অবধি বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধকতার শৃঙ্খলে অবরুদ্ধ ছিল।

চিন্তার স্বাধীনতা

প্রাচীন যুগগুলিতে মানুষের জন্য স্বাধীনভাবে চিন্তাভাবনা করার কোন সুযোগ এবং অধিকার ছিল না। বস্তুতপক্ষে, বহু মাত্রিক অনমনীয় সেন্সরশিপ হল সর্বকালের একটি বিশ্বব্যাপী প্রচলিত সাধারণ রীতি। জনসমাজ ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যাইহোক না কেন, এই সাধারণ রীতির কোন ব্যাতিক্রম হয় নি। দ্যা এনসাইক্লোপিডিয়া অফ রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড এথিকস (The Encyclopedia of Religion and Ethics) এর Persecution (নির্যাতন) নামক শিরোনামে ২৫ পৃষ্ঠার একটি অনুবন্ধে দেখানো হয়েছে প্রাচীন যুগের ইতিহাসে প্রতিটি ছত্রে বিশ্বব্যাপী মানুষজন কিভাবে ঐ মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। 'প্রাচীন সমাজ প্রকৃতিগতভাবে অসহিষ্ণু ছিল (পৃষ্ঠা ৭৪৩)।' এর অর্থ হলো শাসকশ্রেণীর চিন্তা ভাবনাই ছিল জনগণের চিন্তা ভাবনা। সাধারণ মানুষকে শাসকশ্রেণীর চিন্তার সম্মুখে মাথা নত করতে হতো।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে মানব চিন্তার উপর প্রহরা বা Censorship বিষয়ক শিরোনামে আট পৃষ্ঠার একটি প্রচ্ছদ রয়েছে। যাতে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিভাবে চীনের প্রাচীর নির্মাণকারী সম্রাট শিন হুয়াং তি (Shin Huang Ti) এর আমলে চীনের নাগরিকদের স্বাধীন ভাবে চিন্তাভাবনা করার অধিকার ও সুযোগ হরণ করা হয়েছিল। তিনি ২১৩ সালে রাষ্ট্রীয় ফর্মান জারী করে চিকিৎসা ও কৃষি বিষয়ক পুস্তক ছাড়া সমগ্র পুস্তক পুড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পাঁচশত পন্ডিত ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং সহস্রাধিক পণ্ডিতকে দেশান্তরী করা হয়। নিষিদ্ধ পুস্তকগুলি ৩০ দিনের মধ্যে পুড়িয়ে দিতে না পারলে তার শাস্তি ছিল তপ্ত লৌহ শলাকার ছ্যাঁকা দিয়ে অপরাধীকে চিহ্নিত করা এবং বেকার শ্রম দিতে বাধ্য করা।[৭৯]

স্পার্টার অধিবাসীবৃন্দ এবং গোড়ার দিকে রোমান, ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ একই ধরনের অত্যাচারের শিকার হয়েছিল। প্লুটার্ক (Plutarch) এর বর্ণনা অনুসারে, প্রাচীন স্পার্টার বাসিন্দারা শুধুমাত্র ব্যবহারিক কাজের জন্য লেখাপড়া শিখতো। সমস্ত প্রকার জ্ঞানমূলক ক্রিয়াকর্ম যথা যেকোনো বই বা কোন বিষয়ের উপর রচিত সুসংবদ্ধ গ্রন্থ পাঠ করা এমনকি কোনো বিদ্বান ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করাও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। গণতান্ত্রিক এথেন্সে কলা ও দর্শন বিকাশ লাভ করেছিল। কিন্তু অনেক শিল্পী ও দার্শনিক, যাদের মধ্যে সক্রেটিস, অ্যারিস্টোটল, এস্কিলাস, ইউরিপিদিস ও ফিদিয়াস এর মত মানুষ ও ছিল, তাদেরকে জেল হাজতে বন্দী, হত্যা অথবা নির্বাসিত করা হয়। আবার কেউ কেউ পালিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করে।[৮০]

প্রাচীন রোমেও চিন্তা ভাবনার উপর প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত করার জন্য একটি স্থায়ী সরকারি দপ্তর ৪৪৩ খ্রিস্টপূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নিবন্ধে বলা হয়েছে পরোক্ষ ইঙ্গিত, বিবৃতি এবং সমালোচনা সবই দেশদ্রোহিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল। দার্শনিক ও বাগ্মী পন্ডিতদেরকে নির্বাসিত করা হয় এবং শিল্পীদের রাজনৈতিক অধিকার, আইন প্রয়োগ করে খর্ব করা হয়। শাসকশ্রেণীদের সম্পর্কে সমালোচনা মূলক বিবৃতি প্রদান করার জন্য অনেক বিশিষ্ট নাগরিকদের নানা উৎপীড়নের শিকার হতে হয়।[৮১]

যিশুখ্রিস্টের পরে প্রায় তিন শতাব্দী ধরে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে মত পার্থক্য থাকার জন্য ইহুদী এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে ব্যাপক বিরোধিতা ও লড়াই চলছিল। সর্ব প্রথম ইহুদী কতৃক খ্রিস্টানরা ব্যাপক ভাবে আক্রান্ত ও অত্যাচিত হয়। চতুর্থ শতাব্দীতে যখন খ্রিস্টানধর্ম রাষ্ট্রধর্মে পরিনত হয় এবং খ্রিস্টানদের হাতে ক্ষমতা আসে, তখন খ্রিস্টানরাও ইহুদীদের উপর সুদে আসলে বদলা নেওয়া শুরু করে।[৮২]

অতীত দিনগুলিতে চিন্তার স্বাধীনতার উপর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার অন্যতম কারণ হলো, বৌদ্ধিক স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্টি হলে মানুষের ভ্রান্তিকর প্রক্ষেপ পুষ্ট ধর্মের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক শ্রেণী কাঠামো সংকটাপন্ন হতো। যদি স্বাধীন গবেষণার পথ উন্মুক্ত হতো, তাহলে শাসকগণ তাদের উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক মানুষের দ্বারা সৃষ্ট ভ্রান্তিকর ধর্মবিশ্বাসকে অভ্রান্ত ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারত না। সেইজন্য ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে যেসকল ব্যক্তিবর্গ স্বাধীন বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিল, খ্রিস্টান চার্চ গুলি তাদের ওপর নির্মম নিগ্রহ চালিয়েছিল। ধর্মীয় কর্তা ব্যক্তিগণ তাদের কর্তৃত্ব হারাবার ভয়ে ভাবী বিজ্ঞানীদের উপর বর্বর আচরণ করতো। তাদের নির্যাতন অত্যাচারের বিস্তারিত বর্ণনা ড্রিপিয়ার (Drapier) এর লেখা বিজ্ঞান ও ধর্মের দ্বন্দ্ব (Conflict between Science and Religion) নামক বইতে পাওয়া যায়। তবে নামকরণে শুধু ধর্ম না দিয়ে 'খ্রিস্টধর্ম এবং বিজ্ঞানের দ্বন্দ' নাম দিলে তা অধিক যুক্তিযুক্ত হতো।

মানব বৈষম্য

প্রাচীন যুগ গুলিতে স্বাধীন চিন্তাভাবনার উপর নিষেধাজ্ঞার কারন গুলির মধ্যে একটি কারন হলো বহুশ্বরবাদ। কারন ধর্মীয় বিশ্বাসের দ্বারা এটি জনগণকে বোঝানো যেত যে, যে সকল ব্যক্তি বাদশাহীর আসনে অধিষ্ঠিত হয়, সে সাধারণ কোন মানব নয় বরং তারা কোন না কোন ভাবে ঐশ্বরিক গুনাবলীর অধিকারী। আর এভাবেই সাধারন মানুষ মাত্রই তাদের প্রজা হিসাবে থাকতো এবং তারা নিজেরা কেবলমাত্র শাসক নয়, ঐশ্বরিক মর্যাদা ভোগ করতো।

এমনতর অন্ধকার ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্ম বিশ্বাস মানুষের নিকট থেকে তার স্বাধীন চিন্তাশক্তিকে কেড়ে নিয়েছিল। তাদের ধারণা ছিল, যা রাজা-বাদশাহর আদেশ তাই সর্বাপেক্ষা সঠিক ও যথার্থ। কারোরই ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করার বিশেষাধিকার ছিল না। তবে যদি কারোর মত প্রকাশ করার অনুমতি মিলত, তাহলে সে রাজ-আদেশ সমর্থন করেই তার মত প্রকাশ করত। এই ভ্রান্তিকর ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি এমন কঠোর রক্ষণশীল মনোভাবের দরুন সেই সময়ে বৌদ্ধিক স্বাধীনতাহীন এক শ্বাসরোধী পরিবেশ তৈরি হয়েছিল।

সপ্তম শতকে ইসলামের আবির্ভাবের সাথে সাথে এ কথা ঘোষিত হয় - সকল প্রকার মহত্ত্ব কেবলমাত্র ঈশ্বরের জন্যই নির্দিষ্ট; ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। পয়গম্বর মুহাম্মদ (সাঃ) বহুবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে একথা ঘোষণা করেন যে সকলেই সমান এবং একে অপরের ভাই।

ধর্মীয় পরিভাষায় একেই বলে একেশ্বরবাদ। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) শুধু এই বাস্তবতা ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হননি। সেই সাথে সমতার মূল নীতির উপর ভিত্তি করে তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেন। পয়গম্বরত্বের সূচনার সময় গুলিতে তিনি এই নীতির কেবলমাত্র মৌখিক প্রবক্তা ছিলেন। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর শাসক হিসেবে তিনি এই নীতির বাস্তবায়ন করেন। এভাবেই ইসলাম জাতি, বর্ণ,সামাজিক প্রতিপত্তি ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত বৈষম্যের পরিসমাপ্তি ঘটায়। নৈতিক মর্যাদার মানদণ্ডে প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত মর্যাদা নির্ণীত হতে থাকে।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা

একেশ্বরবাদের উপর ভিত্তি করে ইসলাম যে বিপ্লবের সূচনা করে তার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম সর্বজনীন সমানাধিকারের সামাজিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর ফলে এমন এক সমাজ ব্যবস্থা গঠনের পথ প্রশস্ত হয় যেখানে প্রত্যেক মানুষ সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত হয়ে

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করতে থাকে। এই ধরনের স্বাধীনতা কোন জনগোষ্ঠী কখনো কোথাও ভোগ করতে পারেনি। পারস্য সম্রাট প্রথম খসরু যিনি ৫৩১-৫৭৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সাসানিদ সাম্রাজ্যের শাসক ছিলেন, তাঁর রাজত্বকালে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা কেমন ছিল, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। প্রথম খসরু পারস্যের একজন ন্যায় পরায়ণ সম্রাট হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তবুও তাঁর শাসনকালে একজন পারিষদকে রাজদরবারের মধ্যে ভারী কাঠ দিয়ে মাথায় আঘাত করে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। কারণ সেই পারিষদ রাজার নীতিকে সমালোচনা করার দুঃসাহস দেখিয়েছিল। এমন শাস্তি প্রদান বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়; বরং কোনপ্রকার সমালোচনা বা মতপার্থক্য ছিল রাজদ্রোহীতার সামিল। এই ধরনের অন্যায়ের জন্য মৃত্যুদণ্ডই ছিল সর্বাপেক্ষা মৃদু শাস্তি।

ইসলামের আগমন হলে ইসলাম শুধু একান্ত আন্তরিকতার সাথে বুদ্ধির মুক্তির কথা ঘোষণা করে নিশ্চুপ থাকে নি,সমাজ ও রাষ্ট্রের এমন পরিবর্তন নিয়ে আসে যে সেখানে মানুষ সাহসিকতার সাথে প্রাচীন সকল বর্বরতাকে পদদলিত করে স্বাধীনভাবে তাদের মতপার্থক্য প্রকাশ করার এবং তাদের নেতা ও রাষ্ট্রপ্রধানের সমালোচনা করার অধিকার প্রাপ্ত হয়।

ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সা:) আরবের রাষ্ট্রপ্রধানের আসনে অধিষ্ঠিত হলেও একজন সাধারন মানুষের মতো জীবনযাপন করতেন। ফলে প্রতিটি ব্যক্তি তাঁর সামনে স্বাধীনভাবে তার নিজের মত উপস্থাপন করার অধিকার পেত। বদর যুদ্ধের সময় এরকম একটি ঘটনা ঘটেছিল। বদরের সফরে মুহাম্মদ (সা:) একটি স্থানে তাঁবু স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন। এক ব্যক্তি, যার নাম খাব্বাব বিন আল মুনযির, তাঁর সামনে এসে নির্ভয়ে প্রশ্ন করল, 'এই যে স্থানে আপনি অবস্থানের জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন, তা কি ঐশ্বরিক নির্দেশনা প্রাপ্ত হয়েই করলেন, নাকি আপনার একান্ত ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত?' পয়গম্বর (সা:) জবাব দেন, 'এখানে আমি আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছায় অবস্থান করছি।' এই উত্তর শুনে খাব্বাব বিন আল মুনযির বললো - 'এটি অবস্থানের যোগ্য কোন স্থানই নয়। সাথীদেরকে নিয়ে এখান থেকে অন্যত্র চলুন।' তার এহেন দুঃসাহসী আচরণে নবী (সা:) ক্ষুব্ধ হলেন না, বরং সে কেন অন্যত্র

তাঁবু স্থাপনের কথা ভাবছিল তিনি তা জিজ্ঞাসা করলেন। তার যুক্তি শোনার পর তিনি তার সাথে সহমত হলেন এবং তাঁর সঙ্গীসাথীসহ অন্যত্র তাঁবু স্থাপনের জায়গার খোঁজে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। পয়গম্বর ও তাঁর সাথীরা খাব্বাব বিন আল মুনযির এর প্রতি যে আচরণ করেছিল তার দ্বারা এটা ধারণা করা যায়, ইসলাম কত গভীরভাবে সমানাধিকারের নীতি সমাজে প্রতিষ্ঠা করেছিল। পয়গম্বর মুহাম্মদ (সা:) এর জীবনী 'সিরাতে' ঘটনাটি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ইসলামের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একত্ববাদের বিপ্লব এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, সমগ্র ইসলামের ইতিহাসে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে। পয়গম্বরের পরবর্তী যুগে মহান খলিফাদের শাসন কালে সমাজের যে কোন স্তরের যেকোনো নাগরিক খলিফাদের সমালোচনা করতে পারত। এই যুগের ইতিহাসে এইরূপ ঘটনার অসংখ্য নজির রয়েছে।

ইসলামের এই বিপ্লবের প্রভাব এতটাই সুদুরপ্রসারী ছিল যে পরবর্তী যুগে যখন খেলাফতের বদলে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ইসলামের আগমনের পর ১৪ শত বছরের ইতিহাসে কখনোই কোন শাসক নাগরিকের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করতে পারেনি।

ধর্মীয় সহনশীলতার কিছু উপমা

রাসুলুল্লাহ (সা:) এবং তাঁর সঙ্গীগণের দ্বারা যে, ইসলামী বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল, তা কেবলমাত্র একটি ধর্মীয় বিষয়ের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। পরবর্তী হাজার বছর ধরে ইসলামের অনুসারীগণ আরবের সীমানা ছাড়িয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল এবং সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করেছিল। এই পুরো সময়টিতে কোথাও কখনো চেতনার উপর প্রহরার লাগাম পরানোর চেষ্টা করা হয়নি। প্রতিটি ইসলামী রাষ্ট্রে জনগণ পূর্ণ মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করতো। এখানে আমরা প্রফেসর আর্নল্ড (Professor Arnold) কতৃক লিখিত দ্যা প্রিচিং

অফ ইসলাম (The preaching of Islam) নামক বই থেকে কিছু নমুনা পেশ করতে পারি। লেখক তাঁর বইতে, নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত একজন স্প্যানিশ মুসলিমের বিবৃতির কিছু অংশ উল্লেখ করেছেন। তিনি 'ইনকুইজিশন'এর মাধ্যমে লাঞ্ছনার প্রতিবাদ জানিয়ে, তার বিপরীতে তার সহধর্মীদের সহিষ্ণুতার কথা উল্লেখ করে বলেছেন-এটি সত্য যে, কোন ব্যক্তি যদি আমাদের ধর্ম গ্রহণ করার ইচ্ছে প্রকাশ করে, আমরা তাকে সাদরে গ্রহণ করার জন্য দুই হাত প্রসারিত করে থাকি। তবে কুরআন আমাদেরকে অন্যের বিবেকের উপর অত্যাচার করার অনুমতি দেয় না।[৮৩]

অতঃপর তুর্কীদের ধর্মীয় সহনশীলতার বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে লেখক বলেন, (অটোমান সম্রাটদের) গ্রীস জয় করার পর কমপক্ষে দুই শত বছর পর্যন্ত তাদের খ্রিস্টান প্রজাদের সাথে ধর্মীয় বিষয়ের উপর এমন সহনশীলতার নজির পেশ করেছেন, যা সেই যুগে ইউরোপের বাকি অন্যান্য অংশ গুলিতেও অলীক ও দূর্লভ ছিল।[৮৪] অষ্টাদশ শতাব্দীর এন্টিওকের প্যাট্রিয়াস ম্যাকারিয়াস (Macarius, Patriarch of Antioch) তাঁর নিজস্ব ভাষায় তুর্কীদের সেই উদার গুণাবলীর বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন, ' ঈশ্বর তুর্কীদের (উসমানী) সম্রাজ্যকে সর্বদা কায়েম রাখুক! কারন তারা জিজিয়া গ্রহন করলেও কখনোই তারা খ্রিষ্টান বা নাজারেইন, ইহুদি বা সামেরীয় কোন প্রজাবৃন্দের ধর্মীয় বিষয়ে দখলদারিত্ব করেন না।'[৮৫]

প্রফেসর আর্নল্ড মুসলিম শাসন আমলের চিন্তাধারা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপরে আরও বেশ কিছু উপমা পেশ করে বলেন, যে সমস্ত রোমান প্রদেশ গুলিতে মুসলিমরা বিজয় অর্জন করেছিল, সেই সকল বিজিত অঞ্চলের অধিবাসীরা হঠাৎ করে নিজেদের এমন এক স্বাধীন পরিবেশ উপহার পেলো, যা তাদের কাছে তার পূর্বে শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত অপরিচিত ছিল। সপ্তম শতাব্দীর ইতিহাসে এ জাতীয় সহনশীলতা দুর্লভ ছিল।

ধর্মীয় স্বাধীনতা

আব্বাসিয় খলিফা আল মামুনের (৮১৩-৩৩) এর রাজত্বকালে একটি ঘটনা উল্লেখ করে প্রফেসর আর্নল্ড তাঁর লিখিত 'The Preaching of Islam' এ বলেন, আব্বাসিয় খলিফা আল মামুন (৮১৩-৮৩৩) জানতে পারেন যে, ' ইসলামের বিরোধকারীরা রটিয়ে বেড়াচ্ছে যে, ইসলাম তার সত্যতার প্রমান পেশ করার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়নি বরং তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তরবারির ক্ষমতা বলে।' তখন খলিফা তৎকালীন সময়ের প্রতিটি ধর্মের অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের বাগদাদে আমন্ত্রণ জানান। এই মহাসম্মেলনে মুসলিম পণ্ডিতগণ তাদের ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচারিত রটনার যথোপযুক্ত জবাব দেন এবং পরিশেষে সকলেই স্বীকার করেন যে মুসলিমগণ যে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তা যথাযথ এবং সন্তোষজনক।[৮৬] প্রফেসর আর্নল্ড আরো লিখেছেন- খলিফা আল মামুন ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় উদ্যোগী ছিলেন। কিন্তু তিনি কখনই তার রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করে জোরপূর্বক তাঁর নিজের ধর্মবিশ্বাসকে অন্যের উপরে চাপিয়ে দিতে চাননি।[৮৭]

বাগদাদের উক্ত ধর্মীয় মহাসম্মেলনে অন্যান্য ধর্মের যত জ্ঞানীগুণীগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন, ইয়াজদান বখত (Yazdan Bakht)। তিনি ইরান থেকে বাগদাদে এসেছিলেন এবং তিনি ম্যানিশিয়ান (Manichean) মতাদর্শের নেতা ছিলেন। ইয়াজদান বখত যখন মুসলিম পণ্ডিতগণের কথা, প্রমান, যুক্তি এবং তাদের পরিচ্ছন্ন উপস্থাপন দেখেন ও শোনেন তখন তিনি ইসলামের সৌন্দর্য ও সত্যতার শক্তি অনুধাবন করতে পারেন। তখন খলিফা আল মামুন তাঁকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রস্তাব দেন। ইয়াজদান বখত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, 'হে বিশ্বাসীদের নেতা ! আমি আপনার কথা শুনলাম এবং আপনার পরামর্শ জানলাম। তবে আপনি তো সেই ব্যক্তি যিনি কাউকেই নিজের ধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করেন না।' খলিফা তাঁর বিফলতার জন্য তাঁর প্রতি রুষ্ট না হয়ে, বরং তাঁর জন্য সশস্ত্র

দেহরক্ষীর ব্যবস্থা করলেন যাতে কোন ধর্মোন্মাদ জনতার হাতে তিনি অবমাননার শিকার না হন।[৮৮]

ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যার ভিতরে যেমন সকল প্রকার চিন্তা-দর্শনের স্বাধীনতা রয়েছে তেমনই প্রত্যেক চিন্তাশীল মানুষ, তাঁর চিন্তাভাবনার অভিমুখ বিপরীতমুখী হলেও, তাঁর জন্য যথাযথ সম্মান রয়েছে। ইসলাম চিন্তার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি জানানোর পাশাপাশি সমস্ত ঘরানার চিন্তা ধারাকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে।

আধুনিক যুগ এবং ইসলাম

বর্তমান যুগে চিন্তার স্বাধীনতাকে সর্বোচ্চ কল্যানময় বলে (সাম্মাম বোনাম) মনে করা হয়। সাধারণভাবে গণ্য করা হয় যে, এই স্বাধীনতা পশ্চিমা বিজ্ঞানের বিপ্লবের ফল। বস্তুত, এটা তার আশু কারণ হলেও, আধুনিক বিজ্ঞানের বিপ্লব (পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচিত হয়েছে) ইসলামের একেশ্বরবাদী বিপ্লবের ফসল।

ফরাসি দার্শনিক জিম জ্যাক রুশো (Jeam Jacques Rousseau) (১৭১২-১৭৭৮) যাকে আধুনিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন গন্য করা হয়, তিনি তাঁর লিখিত দ্যা সোশাল কন্ট্রাক্ট (The Social Contract) নামক গ্রন্থের সূচনায় বলেছেন, "মানুষ স্বাধীন ভাবে জন্ম নেয়। কিন্তু আমি তাকে শেকলে আবদ্ধ অবস্থায় পাই।" মানুষের দাসত্ব সম্পর্কে রুশোর এই খেদোক্তি একান্ত ভাবে তাঁর নিজস্ব নয়, বরং এটা ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) (৫৮৬-৬৪৪) এর সেই চমৎকার চিন্তাদর্শনের প্রতিধ্বনিমাত্র যা মিশরের গভর্ণর হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) কে লক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'ওহে আমর! তুমি কবে থেকে মানুষদের গোলাম বানানো শুরু করলে? অথচ তাদের মা তাদেরকে স্বাধীন হিসাবে জন্ম দান করেছিল।' গভর্নর আমরের পুত্র এক ঘোড় দৌড় প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে ওই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী এক

মিশরীয় যুবককে বেত্রাঘাত করেছিল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে খলিফা ওমর গভর্নরকে তিরস্কার করে, কথাগুলি বলেছিলেন।

বর্তমান যুগে ইউরোপে এবং তারপর সমগ্র বিশ্বে স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে সেটি মুলত বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়, যার প্রথম পর্যায় সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের আগমনের পর সংঘটিত হয়েছিল।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা

মানবাধিকারের জন্য জাতিসংঘের পক্ষ থেকে সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ১৮ নং আর্টিকেলে বলা হয়েছে,"প্রত্যেকের মতামত, বিবেক ও ধর্মের বিষয়ে স্বাধীনতা রয়েছে। এই অধিকারের সঙ্গে ধর্ম বা বিশ্বাস পরিবর্তনের অধিকার এবং সেই সাথে প্রকাশ্যে বা একান্তে, একা বা সমষ্টিগত ভাবে শিক্ষাদান, অনুশীলন, উপাসনা বা ব্রত পালনের মাধ্যমে ধর্ম বা বিশ্বাস ব্যাক্ত করার অধিকার অন্তর্ভুক্ত থাকবে।'

জাতিসংঘের এই চার্টারটিও প্রকৃতপক্ষে জাতিসংঘের উদ্ভাবিত নয় বরং সেটিও সেই ইসলামী বিপ্লবের অংশ, যা জাতিসংঘের ঘোষণার এক হাজার বছরেরও অধিক পূর্বে ঘোষিত হয়েছিল।

ইসলামই ইতিহাসে সর্ব প্রথম বহুশ্বরবাদের সেই সমস্ত রীতিনীতিকে উৎপাটিত করেছিল যা মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরির মানসিকতাকে উৎসাহিত করেছিল। সেই অবাস্তব বিভেদের ফলশ্রুতিতে হিসেবে যে সামাজিক অবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা সমগ্র প্রাচীন যুগের সর্বস্তরে পরিব্যপ্ত ছিল।

ইসলাম একদিকে যেমন মানুষের চিন্তার জগতে পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল, তেমনি বিস্তৃত পরিসরে একটি কার্যকরী বিপ্লব সংগঠিত করেছিল যা মানুষের স্বাধীনতা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এক নতুন যুগের সূচনা করে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই বিপ্লব আরও শক্তি অর্জন করতে থাকে, যার চূড়ান্ত

পরিণতিতে সমগ্র ইউরোপে এর হিতৈষী প্রভাব পড়েছিল। এর চূড়ান্ত পরিণতিতে সেখানে আধুনিক গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা বিকাশ লাভ করেছিল যা সর্বকালের জন্য বিদ্যমান আছে বলে আধুনা মানুষ মনে করে থাকে। ইউরোপের এই গণতান্ত্রিক বিপ্লব হলো ইসলামী বিপ্লবের এক ধর্মনিরপেক্ষ সংস্করণ যার অভিঘাত সপ্তম শতকের আরবে প্রথম পরিলক্ষিত হয় এবং যিনি এই অভিঘাতের সূচনা করেন তিনি অন্য আর কেউ নন, তিনি হলেন ঈশ্বরের শেষ পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)।

বৈজ্ঞানিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ভিত্তিতে একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামই হল আধুনিক যুগের প্রকৃষ্ট রূপকার।

সমাপ্ত

NOTES

1. Henri Pirenne, History of Western Europe.
2. Philip K. Hitti, History of the Arabs (London, 1989), p. 4.
3. Ibid., p. 307.
4. Henri Pirenne, History of Western Europe.
5. Encyclopaedia Britannica (1984), Vol. 4, p. 522.
6. Ibid., Vol. 16, p. 118.
7. J.M. Roberts, History of the World, p. 238.
8. Encyclopaedia Britannica (1984), Vol. 17, p. 899.
9. Sahih, Muslim, Vol. 4.
10. Moseoleban, The Arab Civilization.
11. Henri Pirenne, History of Western Europe, p. 46.
12. William E. Connolly; Political Theory and Modernity (London, 1988).
13. Encyclopaedia Britannica (1984), Vol. 4, p. 522.
14. Ibid, Vol. 1, p. 227.
15. Ibid, Vol. 1, p. 479.
16. Ibid, Vol. 3, p. 1084.
17. Philip K. Hitti, History of the Arabs (London 1970), p. 166.
18. The Cambridge History of Islam (London), Vol. 2-B, p. 888-89.

19. Baron Carra de Vaux, The Legacy of Islam (1931).
20. Montgomery Watt, Majesty That Was Islam (London), p. 232.
21. Ibid, p. 226.
22. Ibid, p. 226.
23. Ibid, p. 227.
24. Ibid, p. 228.
25. Philip K. Hitti, History of the Arabs (London, 1970), pp. 575-76.
26. Ibid, p. 380.
27. Encyclopaedia Britannica (1984), Vol. 16, p. 367.
28. Ibid, Vol. 16, p. 367.
29. Ibid, Vol. 16, p. 366.
30. Ibid, Vol. 16, p. 366.
31. The Encyclopaedia of Religion and Ethics discusses this in detail in its article on ÒHoliness.Ó
32. Encyclopaedia Britannica (1984), Vol. 12, p. 877.
33. Ibid, Vol. 16, p. 124.
34. Ibid, Vol. 16, p. 124.
35. Statesman (New Delhi), September 4, 1967.
36. Indian Express (New Delhi), September 7, 1967.
37. Encyclopaedia Britannica (1984), Vol. III, p. 206.
38. ibid, Vol. III, p. 380.

39. Bertrand Russell, History of Western Philosophy, p. 395.
40. Encyclopaedia Britannica (1984), Vol. 15, p. 646.
41. Fred Hoyle, The Intelligent Universe, p. 29.
42. Briffault, Making of Humanity, p. 190.
43. Ibid, p. 202.
44. The Encyclopaedia Britannica, Vol. 15, p. 646.
45. Philip K. Hitti, History of the Arabs (London, 1970), p. 307.
46. Bertrand Russell, The Impact of Science on Society, p. 29.
47. Ibid, p. 17.
48. Arnold J. Toynbee quoted in Reader's Digest, March 1974.
49. Encyclopaedia Britannica (1984), Vol. 14, p. 385.
50. Encyclopaedia Britannica (1984), Vol. 18, p. 1013.
51. Edward Mc Nall Bums, Western Civilization (New York, 1955), p. 36.
52. Encyclopaedia Britannica (1984), Vol. 8, pp. 942-43.
53. Ibid, Vol. 7, p. 850.
54. Ibid, Vol. 9, p. 280.
55. William L. Wonderly and Eugene Nida in Linguistics and Christian Missions,

Anthropological Linguistics, Vol. 5, pp. 104-144.
56. Philip K. Hitti, History of the Arabs (London, 1970) p. 573.
57. Wilfrid Blunt, quoted in The Times (London), April 2, 1976.
58. The Times of India (New Delhi), January 30, 1989, p. 6. 59. Dilip M. Salwai, Story of Zero (New Delhi).
60. Encyclopaedia Britannica (1984), Vol. I, p. 469.
61. Ibid, Vol. 10, p. 817.
62. Bertrand Russell, A History of Western Society (London, 1984), p. 416.
63. Encyclopaedia Britannica (1984), Vol. I, p. 1175.
64. Ibid, Vol. 17, p. 129.
65. Ibid, Vol. 12, p. 882.
66. Philip K. Hitti, History of the Arabs (London, 1970), p. 528.
67. Bertrand Russell, A History of Western Philosophy, p. 416.
68. Encyclopaedia Britannica (1984), Vol. X, p. 76.
69. Ibid, Vol. 9, p. 148.
70. Philip K. Hitti, History of the Arabs (London, 1970), p. 568.

71. Encyclopaedia Britannica (1984), Vol. 9, p. 147.
72. Ibid, Vol. V, p. 816.
73. Mishkat al-Masabih, Chapter entitled Salat alKhushu'.
74. Muslim Rulers, p. 415, with reference to Nafh al Tayyib, Part I, pp. 362-368.
75. Encyclopaedia Britannica (1984), Vol. 8, p. 782.
76. Letters of Swami Vivekanand.
77. Hadith of Bukhari.
78. Encyclopaedia Britannica (1984), Vol. 9, p. 144.
79. Ibid, Vol. III, p. 1083.
80. Ibid, Vol. III, p. 1084.
81. Ibid, Vol. III, p. 1084.
82. Ibid, Vol. III, p. 1085.
83. T.W. Arnold, The Preaching of Islam, p. 143.
84. Ibid, p. 157.
85. Ibid, p. 158-59.
86. Ibid, p. 86.
87. Ibid, p. 86.
88. Ibid, p. 85.

Books by Maulana Wahiduddin Khan

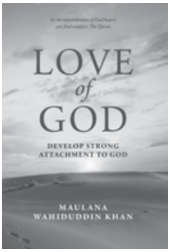

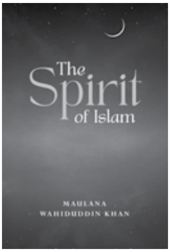

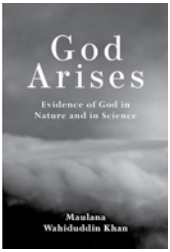

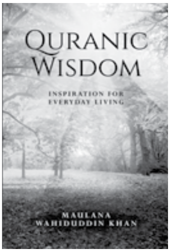

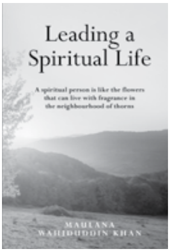

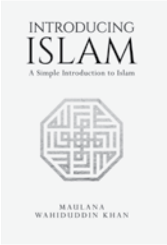

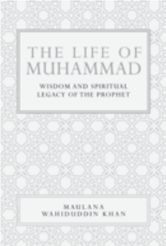

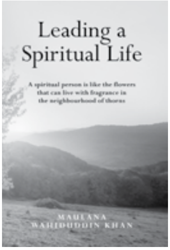

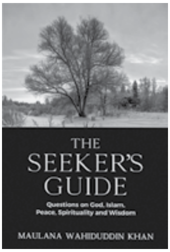

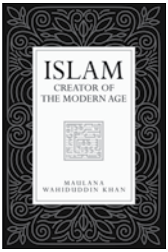

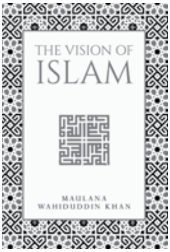

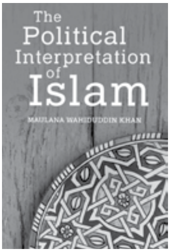

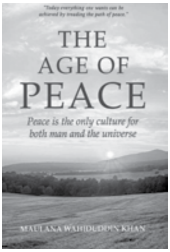

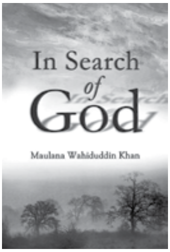

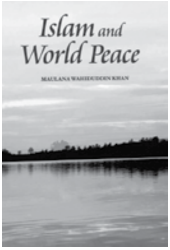

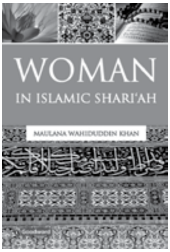

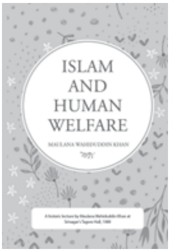

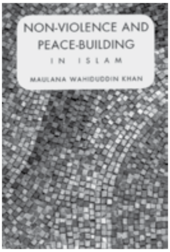

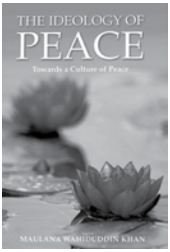

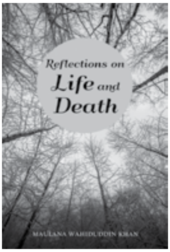

www.goodwordbooks.com www.cpsglobal.org

ইসলামঃ আধুনিক যুগের রূপকার

প্রাচীন যুগ ছিল কুসংস্কারের যুগ; বর্তমানে আমরা বিজ্ঞানের যুগে বাস করি। বর্তমানের চূড়ান্ত শিখরে পৌছনোর পূর্বে, আধুনিক বিজ্ঞানের যুগকে তিনটি ধাপ অতিক্রম করে আসতে হয়েছে। প্রথম ধাপটির বিশেষত্ব হলো কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতার অপসারণ; দ্বিতীয় ধাপে বিজ্ঞান গবেষণার বাস্তবিক সূত্রপাত ঘটেছে; তৃতীয় ধাপে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এবং একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার পরমোন্নতি ঘটেছে। প্রথম দুটি ধাপ উত্তোরণ কালে প্রথম সহস্রাব্দ ব্যাপী ইসলাম যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে, বর্তমান গ্রন্থে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

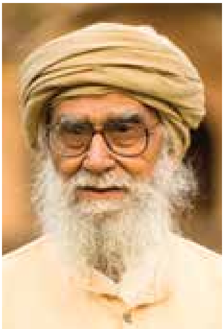

মাওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খান (১৯২৫-২০২১) ছিলেন একজন ইসলামিক পণ্ডিত, আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক এবং শান্তির দূত। তাঁর কাজের জন্য তিনি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছেন। তিনি ২০০ টিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন, এবং সেই সাথে অসংখ্য বক্তৃতার মাধ্যমে ইসলামের আধ্যাত্মিক অর্থের ব্যাখ্যা যুক্তিসংগত আধুনিক শৈলীতে করেছেন। তাঁর কুরআনের ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থটি সহজ, স্পষ্ট এবং সমসাময়িক শৈলীতে লিখিত, এবং তা ব্যাপকভাবে সমাদৃত। তিনি শান্তির সংস্কৃতির প্রতি মানুষের মনকে প্রণোদিত করতে এবং শান্তি, অহিংসা এবং আধ্যাত্মিকতার উপর ভিত্তি করে ইসলামকে আধুনিক ভাবে উপস্থাপন করতে ২০০১ সালে সেন্টার ফর পিস অ্যান্ড স্পিরিচুয়ালটি ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠা করেন।

www.mwkhan.com www.cpsglobal.org

Goodword
www.goodwordbooks.com

PDF

ISBN 978-93-89766-44-8
9 789389 766448